নিরুদ্দেশের দেশে

নীললোহিত

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা ৯

এই লেখকের অন্যান্য বই

সুদূর ঝর্ণার জলে
স্বর্গের খুব কাছে -
ছবিঘরে অন্ধকার
আমার এক টুকরো পৃথিবী
তোমার তুলনা তুমি
তিন সমুদ্র সাতাশ নদী
ভালবাসা নাও, হারিয়ে যেও না

যারা জীবনে কখনো দিকশূন্যপুরে যায়নি, কিংবা সে জায়গাটার নামও শোনে নি, তারা বুঝতে পারবে না তারা কী থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। যার অস্তিত্বই জানা নেই, তাকে না-পাওয়ার তো কোনো দুঃখ থাকে না। কিন্তু যারা দিকশূন্যপুরে একবার গেছে, কিন্তু বারবার ফিরে যেতে পারেনি, তাদের অতৃপ্তির শেষ নেই।

আমি মাঝে মাঝে সেই জায়গাটার কথা ভাবি, কিন্তু আমারও যাওয়া হয়ে ওঠে না। কেউ আমাকে ডেকে নিয়ে যায় দক্ষিণে, কেউ উত্তরে। এই তো কয়েকদিন আগে নিলয়দার সঙ্গে নর্থ বেঙ্গল ঘুরে এলুম, সেখানে সামসিং ডাক বাংলোয় নিলয়দার পা ভাঙলো। তার আগে প্রবালের সঙ্গে যেতে হলো পুণায়। সেখানে ফেরার ট্রেনের টিকিট হারিয়ে ফেলে কী কাণ্ড! প্রবাল সব দোষটা চাপিয়ে দিলে আমার ঘাড়ে। আমার জামার পকেট ফুটো ছিল, তা কি আমি জানতুম? প্রবালের কাছে আর যা টাকা বাকি ছিল, তাতে মাত্র একজনের ফেরার ভাড়া হয়। প্রবাল আমায় বলেছিল, তুই থেকে যা, আমার জরুরি কাজ আছে, ফিরতেই হবে!

আমি যেন একটা ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো। বন্ধু-বান্ধব, চেনা-শুনো যার যখনই বাইরে কোথাও চাকরির ইন্টারভিউ কিংবা অন্য কাজে যাবার দরকার হয় কিন্তু একা যেতে ইচ্ছে হয় না, তখনই সে এসে আমাকে বলে, এই নীলু, চল, চল, একটা ব্যাগ গুছিয়ে নে, বেড়াতে যাবি আমার সঙ্গে! আমার যখন-তখন বেরিয়ে পড়তে ভালো লাগে ঠিকই, কিন্তু সব সময় তো ইচ্ছে না-ও করতে পারে? কিন্তু আমার মৃদু আপত্তি জানাবারও উপায় নেই। কিছু বলতে গেলেই

ওরা ধমক দেয়, ধ্যাৎ, তুই বেকার বসে আছিস, তোর আবার কাজ কী রে ? আমরা তোর ট্রেন ভাড়া দেবো, হোটেলে একঘরে থাকবি, তোর তো কোনো পয়সা খরচাই নেই ! যেন বিনা পয়সায় ট্রেন যাত্রা আর হোটেলের খাদ্য ভক্ষণ করাই আমার জীবনের মোক্ষ।

আজ সকালবেলা ঘুম ভেঙে বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই দেখি সাদা-কালো মেলানো একটা বেশ বড় পাখির পালক পড়ে আছে। পালকটা তুলে নিতেই বুকের মধ্যে কেমন যেন শিরশির করে ওঠে। এটা কোন্ পাখির পালক, আমি চিনি না। পালকটা নিয়ে গালে একটু ছোঁয়াতেই আমার দিকশূন্যপুরের কথা মনে পড়ে যায়। কেউ যেন সেখান থেকে আমাকে ডেকেছে।

দিকশূন্যপুরে কোনো পোস্ট অফিস নেই, সেখানকার লোকেরা চিঠিপত্র লেখে না। এরকম তো অনেক গ্রামেগঞ্জেই এখনো পর্যন্ত পোস্ট অফিস খোলা হয়নি, কিন্তু সেইসব জায়গাগুলো তো আর সৃষ্টিছাড়া হয়ে থাকেনি, কোনো রকমে চিঠিপত্র যাওয়া-আসার একটা ব্যবস্থা হয়ে গেছেই। তাহলে দিকশূন্যপুরের মানুষ কি পায়রা বা হাঁস উড়িয়ে তাদের বার্তা পাঠায় ? না, না, না, সেরকম কিছু না। দিকশূন্যপুরে একটুও ইতিহাসের গন্ধ নেই।

তবু, সকালবেলার মেঘলা আকাশ, কচি কলাপাতা রঙের আলো আর পলিমাটির মতন ঠাণ্ডা নিস্তব্ধতার মধ্যে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে প্রথমেই একটা পাখির পালক চোখে পড়লে মনে হয় না, কোনো একটা জায়গা থেকে ডাক এসেছে ? এটা খুবই গোপন অনুভূতি, কারুকে জানাবার মতন নয়।

একবার ভাবলুম পালকটাকে রেখে দেবো আমার কোনো প্রিয় বই-এর ভাঁজে। কিংবা, ফুলদানিতে সাজিয়ে রাখলে কেমন হয় ? তারপর মনে হলো, নাঃ, এটা জমিয়ে রাখবার জিনিস নয়। আমি বারান্দার বাইরে হাত বাড়িয়ে গ্যালিলিও-র মতন পালকটাকে ছেড়ে দিলুম বাতাসে, সেটা পাক খেয়ে ঘুরতে ঘুরতে চলে গেল নিচে।

অমনি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো বন্দনাদির মুখ।

খানিকক্ষণ সামনের বাড়ির ফুলের টব সাজানো ছাদের ওপরের শূন্যতায় বন্দনাদির মুখখানি বসিয়ে নিঃশব্দে কথা বললুম তাঁর সঙ্গে। বন্দনাদির কপালটা রোদ-পড়া নদীর জলের মতন।

তখনি ঠিক করলুম, আজ আর খবরের কাগজ পড়বো না। রেডিও শুনবো না। পাশের বাড়িতে সুজিতবাবু ও তাঁর স্ত্রী দ্বৈত ঝগড়া-ঝংকার শুরু করলে কান বন্ধ করে রাখবো। ইচ্ছে মতন কান বন্ধ করার একটা নিজস্ব কায়দা আমার আছে। আজ একটি ভিখিরিকে আমার একটা পুরনো জামা দিতে হবে।

দিকশূন্যপুর তো অনেক দূর, তার আগে একবার যেতে হবে বেকবাগানে।

মুড়ি-ডিমভাজা আর চা খেয়ে বেরুতে যাচ্ছি, মা জিজ্ঞেস করলো, এত সাত তাড়াতাড়ি হুড়োহুড়ি করে কোথায় যাচ্ছিস ? জামার বোতামটা পর্যন্ত লাগাস নি !

একটা খাঁকি রঙের খাম উঁচু করে দেখিয়ে আমি সুর করে বললুম, চা-ক-রি-র ই-ণ্টা-র-ভি-উ !

এই খাঁকি খামটা বেশ উপকারী। আমার এক জামার পকেট থেকে আরেক জামার পকেটে নিয়মিত যাতায়াত করে। অনেক জায়গাতেই এটা দেখিয়ে নানারকম সুবিধে পাওয়া যায়।

আগে ইণ্টারভিউ-এর দিন মা আমার পকেটে ঠাকুরের ফুল-বেলপাতা খানিকটা গুঁজে দিত। শততম ইণ্টারভিউ পার হয়ে যাবার পর আর মা উৎসাহ পায় না। আমাদের মায়ের জেনারেশানও এখন বুঝে গেছে যে একালে চাকরি-বাকরি পাওয়ার ব্যাপারে ঠাকুর-দেবতাদের কোনো হাত নেই।

কলকাতা শহর আজ স্নান করে সেজেগুজে আছে। রাস্তায় অনেক চলমান ছাতা। এই রকম ইলশেগুঁড়িতে আমার মাথায় বেশ আরাম হয়। কাল রাত্তিরের জোরালো বৃষ্টিতে কোথাও কোথাও জল জমে আছে। আমার পায়ে রবারের চটি, কোনো অসুবিধে নেই। প্যাণ্টটা একটু উঁচু করে নিলেই হলো। এরকম চটি পরে ইণ্টারভিউ দিতে যাচ্ছি, তাতেও মা-র সন্দেহ হলো না। আজকাল সবই চলে। অবশ্য সে-রকম চাকরিতে আমি কোনোদিনই ডাক পাবো না, যাতে টাই আর মোজাওয়ালা জুতো পরে দর্শন দিতে হয়।

ট্রামে-বাসে এখনো অফিস যাত্রীদের ভিড় শুরু হয়নি। স্কুলের ছেলে-মেয়েরাই যাচ্ছে এখন। সকালবেলা কিশোর-কিশোরীদের ঝলমলে মুখ দেখলে চোখ ভালো থাকে। বেশি বাচ্চাদের স্কুলে পৌঁছে দেওয়া এখন মায়েদের ডিউটি। সুতরাং এখন রাস্তায়, চলন্ত রিক্সায়, বাস স্টপে প্রচুর যুবতী মা। হ্যাঁ, যুবতী মায়েদের দেখলেও চক্ষু ও হৃদয় প্রসন্ন হয়।

ইংরিজি স্কুলগুলি শুরু হয় তাড়াতাড়ি, বাংলা স্কুলগুলো দেরিতে। আমাকে তাড়াতাড়িই যেতে হবে।

বেকবাগানে ট্রাম থেকে নেমে দেড় মিনিট হাঁটলেই তপেশদার বাড়ি। বসবার ঘরে তপেশদা এখনো খবরের কাগজ পড়ছেন, ভেতরে কোনো ঘরে তারস্বরে চিৎকার করছে মাইকেল জ্যাকসন। আজকাল অধিকাংশ বাড়িতে গেলেই, সকালে দুপুরে বা সন্ধেয়, মাইকেল জ্যাকসনের গলা শুনতে হবেই। বীট্লরাও ফিরে এসেছে।

তপেশদা কাগজটা নামিয়ে ভরাট গলায় বললেন, কী নীলু মাস্টার, কী খবর ?

মাস্টার কথাটার মানে এই নয় যে আমি এ বাড়ির ছেলেমেয়েদের পড়াই। ইংলিশ মিডিয়ামের ছাত্রছাত্রীদের পড়াবার বিদ্যেই আমার নেই। ওটা তপেশদার আদরের সম্বোধন।

একটা সোফায় বসে পড়ে আমি জিজ্ঞেস করলুম, আজ আপনার অফিস নেই ?

তপেশদা একটা বেশ ভালো কম্পানির বিক্রি-বিভাগের মাঝারি সাহেব। প্রায়ই তাঁকে গৌহাটি-পাটনা-ভুবনেশ্বরে সফরে যেতে হয়। কলকাতায় থাকলেও কাঁটায় কাঁটায় ঠিক সময়ে অফিসে উপস্থিত হবার বাধ্যবাধকতা নেই। ওঁর হয়তো কোনো শাঁসালো মক্কেলের সঙ্গে আজ গ্র্যাণ্ড হোটেলে লাঞ্চ খাবার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে, যা খুশী খাবেন, বিলের টাকা দেবে কম্পানি। তারপর উনি ঢেঁকুর তুলতে তুলতে অফিস যাবেন। আরামের চাকরি আর কাকে বলে ! প্লেনে চেপে বেড়ানো আর গ্র্যাণ্ড হোটেলে লাঞ্চ। আমায় এই চাকরি কেউ দেয় না ? জিনিস বিক্রি করা আর কী শক্ত ! আমায় কেউ তাজমহলটা বিক্রি করে দিতে বলুক না··· !

তপেশদা বললেন, হ্যাঁ, যাবো এখন ! তারপর তোমার খবর-টবর কী ? কাজ-টাজ পেলে কিছু ?

আপনি তো দিলেন না কিছু ব্যবস্থা করে।

তোমায় বললুম, টাইপিং শিখে-টিখে নাও !

অর্থাৎ আমায় উনি কেরানিগিরিতে বসাতে চান। নিজে ঘুরবেন প্লেনে প্লেনে, আর আমি অফিসে রোজ এক চেয়ারে বসে টাইপ মেশিনে খটাখট করবো ? ঐ ফাঁদে আমি পা দিচ্ছি আর কি !

—আমি দুটো জায়গা থেকে অফার পেয়েছি। একটা কিছু হয়ে যাবে।

বেশি কৌতূহল না দেখিয়ে তপেশদা বললেন, ভালো, ভালো ! উনি বুঝলেন আমি চাকরির উমেদারিতে আসি নি। তবু ওঁর চোখে খানিকটা কৌতূহল লেগে রইলো।

আজকাল বিনা কারণে কেউ কারুর বাড়িতে যায় না। একটা কিছু উদ্দেশ্য বা উপলক্ষ থাকে। তপেশদা সেইটা বুঝতে চাইছেন, কিন্তু মুখ ফুটে জিজ্ঞেস করতেও পারছেন না। অন্য পার্টিকে কিছুক্ষণের জন্য ধাঁধায় রেখে দেওয়াই আমার স্বভাব।

মাইকেল জ্যাকসন অকস্মাৎ থেমে গেল ভেতরে। শোনা গেল অল্পবয়েসী মেয়েদের গলা। ওরা স্কুলে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছে। তিনজনের স্কুলই কাছে।

তপেশদা আবার খবরের কাগজটা তুলতে যাওয়ার ভঙ্গি করে বললেন, পঞ্জাবের ব্যাপার-স্যাপার দেখেছো ?

যে-হেতু আজ আমি খবরের কাগজ থেকে দূরে থাক্‌বো, তাই সঙ্গে সঙ্গে প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্য বললুম, তপেশদা, আপনি বেশ রোগা হয়ে গেছেন কিন্তু ! চেহারাটা খুব সুন্দর ফিট্ রেখেছেন !

চল্লিশের পর যাদের চেহারা ভারির দিকে যেতে শুরু করে তারা সবচেয়ে খুশী হয় এইরকম কথা শুনলে। তপেশদা লজ্জা লজ্জা ভাব করে বললেন, আমার নিজস্ব একটা সিস্টেম আছে, বুঝলে···।

তপেশদার চুলে সামান্য পাক ধরেছে, তবু তাঁকে এখনো যুবকের মতনই দেখায়। অতি-ভ্রমণের কিছুটা ক্লান্তির ছাপ তাঁর চোখের নিচে। তপেশদা দিকশূন্যপুরের নাম শোনেন নি।

তিন মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে ঢুকলেন অর্চনাদি। বনালি, শ্রাবণী, আর রূপসা। তের থেকে সাত। এর মধ্যে রূপসাই সবচেয়ে ছোট, সে অর্চনাদির নিজের মেয়ে নয়।

অর্চনাদি তপেশদাকে বললেন, আমি তাহলে ঘুরে আসছি। বুঝলে ?

তারপর আমায় দেখে জিজ্ঞেস করলেন, কী নীলু, কখন এসেছো ?

—এই তো একটু আগে।

শুধু যে মেয়েদের স্কুলের জন্য সাজিয়েছেন তাই-ই না, অর্চনাদি নিজেও বেশ সেজেছেন। আটপৌরে শাড়ী পরে আর চুলটুল না আঁচড়ে তো মেয়েদের স্কুলে পৌঁছে দিতে যাওয়া যায় না। তাও অর্চনাদি যাবেন গাড়িতে। কোনো কোনো মা-বাবাকে আমি ট্যাক্সি করেও ছেলেমেয়েদের স্কুলে পৌঁছে দিতে দেখেছি। কে বললো, এ দেশটার কোনো উন্নতি হয় নি ?

আমি রূপসাকে ভালো করে লক্ষ্য করলুম। বেশ হাসিখুশীই তো রয়েছে। স্বাস্থ্যও ভালো। নাকটা যেন একটু লালচে। তা বাচ্চাদের সর্দি হবে না ?

তিনটি মেয়েরই চোখে চোখে তাকিয়ে আমি চেনা হাসি দিলুম। রূপসাকে জিজ্ঞেস করলুম, তোমার গান শেখা চলছে ?

রূপসা লাল-রিবন বাঁধা মাথাটা দুলিয়ে বললো, হ্যাঁ।

রূপসার মুখে তার মায়েরই মুখের আদল।

অর্চনাদি বললো, পৌনে নটা বাজে। চল, চল, দেরি হয়ে গেছে। নীলু, তুমি বসো !

তারপর স্বামীকে : তোমার গাড়িটা এক্ষুনি দরকার নেই তো ? আমি একটু গড়িয়াহাট ঘুরে আসবো।

তপেশদা উদারভাবে বললেন, দয়া করে এগারোটা-ট্যাগারোটার মধ্যে ফিরো !

ওরা বেরিয়ে যাবার পর তপেশদা জিজ্ঞেস করলেন, নীলু, তুমি চা-টা কিংবা কফি-টফি কিছু খাবে-টাবে ?

—কফি খেতে পারি।

কফি যে চায়ের থেকে আমার বেশি প্রিয় তা নয়। কফি বলার কারণ ওটা তাড়াতাড়ি বানানো যায়।

তপেশদা বললেন, তুমি বসে কাগজ-টাগজ দ্যাখো-ট্যাখো। আমি একটু আসছি !

তপেশদা সব সময়ে দ্বিত্ব দিয়ে কথা বলেন। খবর-টবর, কাগজ-টাগজ, টাকা-ফাকা, সিগারেট-টিগারেট। জিনিস বিক্রি করা যাদের কাজ তাদের বোধহয় সব কিছুই দু'বার বলতে হয়।

ক্যালেণ্ডারে একটা স্নিগ্ধ হ্রদের ছবি। খুব সম্ভবত সুইটসারল্যাণ্ডের। উঠে গিয়ে দেখলুম ছবিটা আন্দামানের। ভালো দৃশ্য দেখলেই কেন আমাদের বিদেশের কথা মনে পড়ে ?

এ বাড়ির কাজের ছেলেটি কফি এনে দিল। তা বলে এত তাড়াতাড়ি। গরমজল বোধহয় তৈরিই ছিল। হাপুস হুপুস শব্দে আমি কফি শেষ করতে লাগলুম।

তপেশদা ফিরে এসে বললেন, এবারে নীলুমাস্টার, তোমার কথা-টথা শুনি।

আমার প্রয়োজন মিটে গেছে, আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললুম, তপেশদা, আমি এবারে চলি ! পরে আবার আসবো !

তপেশদার মুখে একটা গভীর বিস্ময় ঝুলে রইলো। আমি চাকরির উমেদারি করিনি, ধার চাইনি, এমনকি তপেশদার একটা সিগারেট পর্যন্ত নিইনি। তপেশদার বৃত্তের মধ্যে এরকম কেউ আসে না।

বাইরে বেরিয়ে আমি বাড়িটার দিকে একবার ফিরে তাকালুম। ছিমছাম দোতলা বাড়ি, তপেশদাদের পৈতৃক।

এই বাড়িটাকে আজকাল আমার কাকের বাসা মনে হয়। কাকের বাসায় কোকিলের ছানা মানুষ হচ্ছে। না, না। তপেশদা বা অর্চনাদির সঙ্গে আমি কাকের তুলনা দিতে চাই না, ওঁরা দু'জনেই বেশ ভালো। গলার আওয়াজও তেমন খারাপ নয়। কিন্তু অর্চনাদির ছোটবোন বন্দনাদি সত্যিই কোকিলের মতন। বন্দনাদি একজন শিল্পী এবং তাঁর চরিত্রে খাঁটি বোহেমিয়ানা আছে।

রূপসার যখন তিন বছর বয়েস, তখন বন্দনাদি ওকে নিজের দিদির বাড়িতে

রেখে নিরুদ্দেশ হয়ে যান। তারপর থেকে তপেশদারা তার কোনো রকম সন্ধান পাননি।

আমার দ্বিতীয় গন্তব্য মনোহরপুকুর।

অজিতকাকা রিটায়ার করলেও নিজেকে সবসময় ব্যস্ত রাখতে ভালোবাসেন। তাঁকে বাড়িতে নাও পাওয়া যেতে পারে কিন্তু কাকিমা থাকবেন। নারী জাতির এক প্রথম শ্রেণীর প্রতিভূ এই লীলা কাকিমা। পৃথিবীতে জীবাণুশূন্য জল যেমন দুর্লভ, তেমনই দুর্লভ আত্মগ্লানিহীন নারী। অধিকাংশ মেয়েকেই আমি কখনো না কখনো বলতে শুনেছি, তাদের জীবনে যা পাওয়ার কথা ছিল, তার প্রায় কিছুই পাওয়া হলো না। লীলা কাকিমার জীবনে আমি এরকম মনোভাব মুহূর্তের জন্যও দেখিনি। এমনকি দু'একবার চরম সঙ্কটের সময়েও। এমন মানসিক স্থৈর্য তিনি কোথা থেকে পেয়েছেন কে জানে ! লীলা কাকিমার কথা আমি যখনই ভাবি, তখনই একবার মনে মনে বলি, রিমার্কেবল লেডি ! কেন যে ইংরিজিতে বলি কে জানে ! বাংলায় কী বলা যায় ? মহীয়সী রমণী ? নাঃ, এটা বড্ড দেবী দেবী শোনায় ! লীলা কাকিমা সাধারণের মধ্যেই অসাধারণ !

বাস স্টপে দাঁড়িয়ে আছি, পেছন থেকে কে যেন বললো, হ্যালো, ওল্ড বয় !

চমকে ফিরে তাকিয়ে, পুলকিত বিস্ময়ে দেখলুম রফিককে। এ যে মেঘ না চাইতেই জল ! রফিকের বাড়িতে যাওয়ার কথা আমি একবার চিন্তা করেছিলুম বটে, কিন্তু সেটা আজকের প্রোগ্রামে ঠিক আঁটানো যাবে না। যদিও রফিকের বাড়ি কাছেই। রফিক বিয়ে করার পর ওর বাড়িতে আর বিশেষ যাওয়াই হয়নি।

এই বাদলার দিনেও রফিক দুধসাদা ট্রাউজার্সের সঙ্গে মেরুন রঙের হাওয়াই শার্ট পরেছে, তার ওপর একটা পাতলা রেন কোট। মানিয়েছে চমৎকার। একেবারে সাহেবদের মতন দেখাচ্ছে। জুতোর পালিসও নিখুঁত।

রফিক সাধারণত দশটার আগে বিছানা থেকে ওঠে না। আজ যে সে ন'টার মধ্যেই সেজেগুজে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে, তাতে কলকাতা শহর ধন্য হয়ে গেছে। বিয়ে করলে মানুষ কোনো না কোনো ভাবে বদলাবেই। তবে, আশা করি রফিক এখন ভিড়ের ট্রাম-বাসে উঠবে না। রফিক একবার বলেছিল, অচেনা পুরুষ মানুষদের গায়ের গন্ধ সহ্য করতে পারে না সেইজন্যই সে কোনো অচেনা মানুষের এক হাত দূরত্বে পাঁচ মিনিটের বেশি দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না।

—কী রে, রফিক। কোথায় যাচ্ছিস ?

আমার কথার উত্তর না দিয়ে রফিক হাত তুলে একটা ট্যাক্সি থামালো। তারপর বললো, তুই কোথায় যাবি ? চল, নামিয়ে দিচ্ছি।

আমি যাবো দক্ষিণে, রফিক যদি সুদূরতম উত্তরেও যায়, তা হলেও ওর

আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে লাভ নেই। কতটা ঘুরে যেতে হবে না হবে, রফিক সেকথা চিন্তাও করবে না। তার বনেদিয়ানা এ সবকিছুর ঊর্ধ্বে। পৃথিবী যদি একদিকে ধ্বংস হয়ে যেতেও শুরু করে, তবু রফিক তার আদব কায়দা ছাড়বে না।

ট্যাক্সিতে ওঠবার পর আমি জানলার কাচ নামাতে যাচ্ছি, রফিক মাথা নেড়ে নিষেধ করলো আমাকে। পকেট থেকে বিলিতি সিগারেটের প্যাকেট বার করে প্রথমে একটা আমাকে দিল, তারপর লাইটার জ্বেলে দু'জনের সিগারেট ধরাবার পর বললো, এবার নামাতে পারিস। এইসব লাইটারগুলো শীতের দেশের জিনিস তো। তাই একটুও হাওয়া সহ্য করে না!

এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে রফিক একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো আমার মুখের দিকে বেশ কয়েক মুহূর্ত। যেন সে আমার অন্তস্তল দেখার চেষ্টা করছে।

তারপর ওর সুন্দর পাতলা ঠোঁটে প্রায় অদৃশ্য একটা হাসি ফুটিয়ে, সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে বললো, তুই আমার বউকে আগে ভালোবাসতিস, সেইজন্যই আমার বিয়ের পর তুই আর আমাদের বাড়িতে আসিস না, তাই না?

প্রতিবাদ করা নিরর্থক। এখন রফিকই কথা বলবে এবং ওর মতামতটাই প্রাধান্য পাবে। বিয়ের আগে রফিকের স্ত্রী রোমিকে আমি মাত্র তিনবার দেখেছি, তার মধ্যে দু'বার কোনো কথাই হয় নি, তৃতীয়বার সব মিলিয়ে ছ'সাতটা বাক্য বিনিময় হয়েছে মাত্র।

আমি বললুম, তুই ঠিক বলেছিস। তুই এই বিশ্বের সুন্দরীশ্রেষ্ঠাকে বিয়ে করবি, তাতে আমার হিংসে হবে না?

রফিক শুকনো ভাবে হাঃ হাঃ করে হাসলো। তারপর বললো, ঠিক আছে, দুটো বছর কাটতে দে। দু'বছর পার হয়ে যাক, তারপর তুই রোমির সঙ্গে যত ইচ্ছে প্রেম করিস!

—ওরে বাবা, দু'বছর অপেক্ষা করতে হবে? কেন?

—তা তো হবেই! ম্যারেজ ইজ আ টু ইয়ার্স লং পিকনিক! এই দু'বছর স্বামী-স্ত্রী একেবারে কপোত-কপোতী। তারপর তো রোজকার দানাপানি। তখন বউ কারুর সঙ্গে টুকটাক প্রেম করলো কিংবা স্বামী অন্য মেয়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ সময় কাটালো, এতে কিছু যায় আসে না। তবে, সংসারের শান্তিটা রাখতে পারলেই ভালো।

রফিক এই অদ্ভুত তত্ত্বটা কোথা থেকে জোগাড় করলো কে জানে। কিন্তু এমন জোর দিয়ে বললো যেন এর ওপরে আর কোনো কথা চলে না। রোমিকে বিয়ে করবার জন্যও কত কাণ্ডই না করেছে। সেই উন্মাদনার আয়ু মাত্র

দু'বছর! আমার হাসি পেল। আমি রোমির সঙ্গে দু'বছর বাদে প্রেম করবো? ততদিনে ও আমার নামটাও মনে করতে পারবে কি না সন্দেহ!

খানিকক্ষণ রাস্তার দিকে তাকিয়ে থেকে রফিক আবার হঠাৎ বললো, ও হ্যাঁ, ভালো কথা! আম্মা প্রায়ই তোর কথা বলেন! আম্মা তো একতলার ঘরে থাকেন, তুই আমার কাছে না গেলেও একদিন তো আম্মার সঙ্গে দেখা করলে পারিস?

—হ্যাঁ, যাবো। কেমন আছেন আম্মা?

—ওরকম আলগা ভাবে হ্যাঁ যাবো বলিস না। শিগগিরির মধ্যে একদিন আয়! তুই তো জানিস, আম্মা তোকে দেখলে কত খুশী হন?

রফিকের আম্মার চোখে রফিকের দিদির স্বামী, অর্থাৎ আমাদের সকলের মুরাদ দুলাভাইয়ের সঙ্গে আমার চেহারা ও মুখের খুব মিল আছে। সকলেরই ধারণা মুরাদ দুলাভাই কোনো দুর্ঘটনায় মারা গেছেন, যদিও তাঁর লাশের সন্ধান পাওয়া যায়নি। রফিকের দিদি অবশ্য এখনো আশা ছাড়েন নি, তিনি প্রতীক্ষায় আছেন যে মুরাদ সাহেব একদিন ফিরে আসবেনই।

আমি বললুম, যাবো, নিশ্চয়ই খুব শিগগির একদিন যাবো!

—আবার আলগা ভাবে নিশ্চয়ই যাবো বলছিস? আমি তোকে চিনি না? ঠিক করে যাবি বল!

—তুই আমাকে এত বকছিস কেন, রফিক?

—আই য়্যাম সরি। সত্যি দুঃখিত, নীলু। আই সাপোজ আই য়্যাম ইন ব্যাড মুড দিস মর্নিং!

—কেন, কী হয়েছে?

উত্তর না দিয়ে রফিক ফরাসী কায়দায় কাঁধ ঝাঁকালো।

—তোর দিদি কেমন আছেন রে?

—তা আমি কী করে জানবো? দিদি আছে দিদির মতন। কে কী রকম থাকে তা কি অন্য কেউ বলতে পারে?

কোথায় যাচ্ছিস তুই এই সাতসকালে?

এবারে রফিক কৌতুকের ভঙ্গিতে বাঁ দিকের চোখ টিপে মুচকি হেসে বললো, জীবিকা! হার্ড রিয়েলিটি। তুই তো বিয়ে করিস নি, তুই এসব বুঝবি না!

রফিক আমাকে ত্রিকোণ পার্কের শেষপ্রান্তে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। কারণ আমি ওখানেই নামতে চেয়েছি। আমি ঠিক কোন্ বাড়িতে যাবো তা রফিক জানতে চায় নি একবারও। ছেলেটার এইসব গুণ সত্যিই মনে রাখার মতন।

যা ভেবেছিলুম তাই-ই, অজিতকাকা বাড়িতে নেই। তিনি ন্যাশনাল সেভিংস

সার্টিফিকেট বিক্রির এজেন্সি নিয়েছেন, সেইজন্য সকাল থেকেই তিনি পরিচিত সার্কেলে ঘুরে বেড়ান। লীলা কাকিমা চোখে চশমা এঁটে সেলাই মেশিন নিয়ে বাচ্চাদের জামাকাপড় সেলাই করছিলেন, আমাকে দেখে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন। তাঁর চোখে কৌতূহল। কিন্তু তিনি তপেশদার মতন দ্বিধা করলেন না। পরিষ্কার গলায় বলেন, এসো নীলু, বসো। এই সেলাইটা শেষ করে নিই, কেমন ? হঠাৎ এসে উপস্থিত হলে যে ? নিশ্চয়ই তোমার কোনো উদ্দেশ্য আছে ?

মিথ্যে প্রধানত দু'রকম। সাদা আর কালো। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কিংবা অন্যের ক্ষতি করবার জন্যই কালো মিথ্যের ব্যবহার। আর সাদা মিথ্যে নিয়ে কৌতুক হয়, কখনো কখনো পরের উপকারেও লেগে যায়।

আমি সাদা, কালো, খয়েরি, বাদামি, বেগুনি ইত্যাদি সব রকম মিথ্যেতেই ওস্তাদ। তবে যাদের মনটা সাদা, তাদের সামনে কখনো কালো মিথ্যে বলি না। এইটুকু মাত্র নীতিবোধ আমার আছে।

লীলা কাকিমার প্রশ্নের উত্তরে আমি বিনা দ্বিধায় বললুম, আপনাকে দেখতে এসেছি শুধু!

চশমাটা খুলে, সদ্য পানা পরিষ্কার করা পুকুরের রহস্যময় গভীরতার মতন হেসে তিনি বললেন, কেমন দেখছো ?

লীলা কাকিমার বয়েস আমার ঠিক দ্বিগুণ। এখনো মুখের চামড়া কুঁচকোয় নি। দৃষ্টি স্বচ্ছ। তিনি একটা সাদা খোলের চওড়া নীল কারুকার্যময় পাড়ের শাড়ি পরে আছেন, তবু তাকে যেন এখনো ঝলমলে ছাপার শাড়িতে মানাতো।

আমার যখন পনেরো বছর বয়েস, তখন মনে হতো তিরিশ বছর বয়েসের লোকেরাই তো সব বুড়ো। শুধু চাকরি বাকরি করে, নিছক কাজের কথা ছাড়া আর কিছু জানে না। এখন সাতাশ বছরে পৌঁছে দেখছি, পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছর বয়েসের লোকরাও তো তেমন কিছু বুড়ো বা অপদার্থ নয়। একটু নিজেদের কথা বেশি বলে বটে, তবে কর্মক্ষমতা যেন যৌবনের চেয়েও বেশি। বাঁচতে বাঁচতে আরও কত কী শিখতে হবে!

লীলা কাকিমা অবশ্য নিজের কথাও একদম বলেন না। তাঁর মেজো ছেলে বিজন যখন চিঠি লিখে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়, সেই সময়টায় আমি কলকাতায় ছিলুম না। প্রায় মাস দেড়েক বাইরে থাকতে হয়েছিল। বিজনের ওরকম আকস্মিক কাণ্ডতে লীলা কাকিমা নিশ্চয়ই খুব আঘাত পেয়েছিলেন, কান্নাকাটিও করেছিলেন। কিন্তু তা লোকচক্ষুর অগোচরে। সেই অবস্থায় লীলা কাকিমাকে কেউ দেখেনি।

আমি যখন কলকাতায় ফিরেছিলুম, তখন লীলা কাকিমা সম্পূর্ণ শান্ত। আমাকে তিনি বলেছিলেন, বিজন যে চলে গেল... ও বুদ্ধিমান ছেলে... নিশ্চয়ই ভেবেচিন্তেই গেছে। কত ছেলে তো আজকাল বিদেশে থাকে, পাঁচ-দশ বছর অন্তর দেখা হয়। তারপর দ্যাখো আমরা সাধু সন্ন্যাসীদের শ্রদ্ধা করি, কিন্তু তারাও তো কোনো মা বা বউ-এর মনে কষ্ট দিয়ে সংসার ছেড়ে এসেছে!

লীলা কাকিমা আমার চোখের দিকে তাকিয়ে আছেন, আমি বললুম, আপনাকে গত দশ বছর ধরে আমি একই রকম দেখছি।

লীলা কাকিমা বললেন, তাহলে তুমি দেখতে জানো না। দশ বছর ধরে কি কেউ একরকম থাকতে পারে ? পঞ্চাশ বছর বয়েস হয়ে গেলে জীবনটা একটু অন্যরকম হয়ে যায়, শরীরটা আর আগের মতন থাকে না, শরীর নিয়েই তো জীবন! এই সময় ব্লাডপ্রেসার গণ্ডগোল করে, ব্লাড সুগার হবার ভয় থাকে, হাঁটুতে বা কোমরে ব্যথা হতে পারে...

—এর মধ্যে আপনার কোন্‌টা হয়েছে ?

—কোনোটাই বোধহয় এখনো হয়নি। অন্তত টের পাই না। কিন্তু হতে তো পারে, সেইজন্য মনে মনে তৈরি থাকা ভালো।

—এইসব জামা-কাপড় তৈরি করছেন কার জন্য ?

আমি এগুলো বিক্রি করি, জানো না ? সারাদিন বাড়িতে বসে থাকার বদলে একটা কিছু কাজ করা তো ভালো!

এটা একটা সাদা মিথ্যে। আমি জানি, লীলা কাকিমা ঠাকুরপুকুরের একটি সমাজসেবা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। ওখানকার অনাথ আশ্রমের ছেলেমেয়েদের জন্য তিনি বিনামূল্যে জামা-কাপড় তৈরি করে দেন। কিন্তু লোকের কাছে বলেন, বিক্রি করি। এখনো সেই ব্যাপারটাই চালিয়ে যাচ্ছেন কি না সেটা আমি একটু ঝালিয়ে নিলুম।

উঠে গিয়ে উনি প্লেটে করে দুটি সন্দেশ নিয়ে এলেন আমার জন্য। তারপর বললেন, নীলু, তোমায় দেখে একটা কথা মনে পড়লো। বিজনের তো অনেক প্যান্ট-শার্ট পড়ে ছিল। কিছু কিছু তপন নিয়েছে, কিছু গেছে বাসনওয়ালার কাছে। সেদিন দেখি আলমারিতে একটা শার্ট রয়ে গেছে এখনো। বেশ ভালোই আছে, ছেঁড়ে টেঁড়ে নি। আর বেশিদিন থাকলে নষ্ট হয়ে যাবে। সেই শার্টটা তুমি নেবে ? তোমার গায়ে হয়ে যাবে।

আলমারি খুলে লীলা কাকিমা জামাটা বার করলেন। ওরে বাবা, এ যে অনেক দামী জিনিস। একটা গরদের হাওয়াই শার্ট। এত দামী জামা আমি জন্মে কখনো পরিনি। কেই-বা দেবে!

নিজের জামাটা খুলে ওটা পরে দেখলুম বেশ ফিট করে গেছে।

লজ্জা লজ্জা ভাব করে বললুম, লীলা কাকিমা, আজ আমার জন্মদিন। বেশ আপনার কাছ থেকে একটা উপহার পেয়ে গেলুম।

—আজ তোমার জন্মদিন, সত্যি?

হ্যাঁ বলে আমি টিপ করে একটা প্রণাম করলুম লীলা কাকিমার পায়ে।

এটাও একটা সাদা মিথ্যে!

নিজের জামাটা একটা খবরের কাগজে মুড়ে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এসে আমি একজন পছন্দমতন ভিখিরি খুঁজতে লাগলুম। বৃষ্টি থেমে গেছে, রোদ উঠেছে চড়া, এখন রাস্তায় প্রচুর মানুষজন। প্যাচপেচে কাদা, এখন আর এই শহরটাকে পছন্দ করার কোনো কারণ নেই।

হাঁটতে হাঁটতে চলে এলুম গড়িয়াহাট মোড়ের কাছে। দরকারের সময় ঠিক জিনিসটি কিছুতেই খুঁজে পাওয়া যাবে না? এমনকি ভিখিরি পর্যন্ত। কলকাতা শহরে ভিখিরির অভাব? যে-ক'জনকে দেখছি তারা হয় স্ত্রীলোক বা বুড়ি বা একেবারে বাচ্চা।

শেষ পর্যন্ত বাজারের সামনে প্রায় আমারই যমজ চেহারার একজন ভিখিরির সন্ধান পেয়ে গেলুম। সে আমার সামনে পয়সার জন্য হাত পাততেই আমি মনে মনে বললুম, তুমি আজ একটা জামা উপার্জন করেছো।

আশ্চর্য, সকালবেলা যখন আমি কোনো ভিখিরিকে নিজের একটা জামা দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলুম, তখন স্বপ্নেও ভাবিনি যে আমি নিজেও আজ একটা চমৎকার শার্ট পেয়ে যাবো!

মহাপুরুষরা যে বলে গেছেন কারুকে কিছু দিতে চাইলে নিজেরও অনেক কিছু পাওয়া হয়ে যায়, তা সত্যি নাকি? দু'একদিন মিলে যায় বোধহয়!

॥ ২ ॥

স্টেশন থেকে নেমে সাইকেল রিক্সা। স্টেশনটি অতি নগণ্য, কিছুই নেই বলতে গেলে, প্রায় কেউ নাম জানে না। কাছাকাছি দুটো কারখানা আছে বলে এখানে দু'একটা ট্রেন থামে। সাইকেল রিক্সায় মিনিট পনেরো গেলে হাই-ওয়ে। এ রাস্তায় বাস চলে না। তবে ট্রাকগুলোকে হাত দেখালে থামে, দু'পাঁচ টাকা দিলে কিছু দূর নিয়ে যায়।

প্রায় এগারো মাইল দূরে একটা ছোট জঙ্গলমাখা টিলার পাদদেশে আমি নেমে

পড়লুম ট্রাক থেকে। ছ'টাকা ও তিনটি সিগারেট খরচ হয়েছে।

এবারে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে হাঁটা পথ। ঝকঝকে পরিচ্ছন্ন দিন, গরম নেই বলতে গেলে, এরকম সময়ে হাঁটতে ভালো লাগে। আমার কাঁধে শুধু একটা ঝোলা কাপড়ের ব্যাগ। এগুলোকে শান্তিনিকেতনী ব্যাগ বলে। এক সময় বহুরূপী-দলের 'পথিক' নামের একটি নাটক বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। পরে সেই নাটকটি সিনেমাও হয়। তাতে শম্ভু মিত্রকে সব সময় কাঁধে এইরকম একটা ব্যাগ নিয়ে ঘুরতে দেখা গিয়েছিল। তখন এর নাম হয়ে যায় পথিক ব্যাগ। বেশ চালু হয়ে গিয়েছিল নামটা, কিন্তু বেশিদিন টেঁকেনি।

শান্তিনিকেতন নয়, আমি এই ব্যাগটা কিনেছিলুম রাজারহাট-বিষ্ণুপুর থেকে। ব্যাগ থেকে একটা বাঁশী বার করে ফুঁ দিলুম।

আমি বাঁশী বাজাতে পারি না। আমার এক মামা বাঁশী বাজাতেন এবং তিনি টি বি-তে মারা গিয়েছিলেন। সে বহুকাল আগেকার কথা। বোধহয় আমার জন্মের আগের। কিন্তু সেই থেকে আমার বাড়ির লোকদের ধারণা, বাঁশী বাজালে যক্ষ্মা হয়।

বাড়িতে তো বাজাতে পারি না, তাই দিকশূন্যপুরে যাওয়ার এই জঙ্গলের রাস্তাটায় আমি বাঁশী প্র্যাকটিস করি। বেসুরো হলেও এখানে তো ভুল ধরবার কেউ নেই।

আগেরবার এই পথে একটা সাপ দেখতে পেয়েছিলুম। কোন্‌টা কী জাতের সাপ আমি চিনি না। সাপ দেখলেই আমার গা শিরশির করে। ভেবেছিলুম আমার বাঁশী শুনেই আকৃষ্ট হয়ে সে গর্ত থেকে বেরিয়ে এসেছে। ভয়ে হাত পা কাঁপলেও আমি বাঁশী বাজাতে বাজাতেই দ্রুত পার হয়ে গেছি সে জায়গাটা।

পরে অবশ্য বই পড়ে জেনেছি যে বাঁশীর সুর শুনে সাপেদের মুগ্ধ হওয়ার ব্যাপারটা একেবারে গাঁজাখুরি। সাপেদের নাকি কান নামের বস্তুটাই নেই। সাপুড়েরা বাঁশী বাজাবার সময় দু'দিকে হাত নাড়ে সেই দেখে দেখে সাপ মাথা দোলায়। অর্থাৎ রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটা লাইন ঈষৎ বদলে নিয়ে বলা যায়, "তারে কানে শুনিনি, শুধু বাঁশী দেখেছি!"

চতুর্দিকে তন্নতন্ন চোখে চেয়ে চেয়ে হাঁটছি। এই জঙ্গলে ময়ূরও আছে শুনেছি। এবারে একটা ময়ূর দেখতে পেলে মন্দ হয় না। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে টুকরো টুকরো আকাশ। শাল, সেগুন আর আকাশমণি গাছই বেশি। যে-দিকটায় শাল সেদিকটা বেশ পরিষ্কার তকতকে, সেগুনের বড় বড় পাতার জন্য সেদিকটা ভিজে ভিজে আলো-ছায়াময়। কিছু কিছু গাছ চিনি না। এ জঙ্গলে এখানো কাঠ-চোরদের উপদ্রব শুরু হয়নি।

পথ সংক্ষেপ করবার জন্য একটা টিলার ওপর উঠতে হয়। কাছাকাছি অন্যান্য টিলার মধ্যে থেকে এই বিশেষ টিলাটি আমি চিনে রেখেছি একটি শিমুল গাছ দিয়ে। বনস্পতির মতন তার মাথা সব গাছ ছাড়িয়ে। তার গুঁড়িতে কে যেন কবে একটা আধ-ফালি চাঁদ এঁকে রেখেছে।

কঠিন গ্রানাইট নয়, ঝুরো ঝুরো লাল পাথরের সেই টিলাটির ওপর উঠে আসতে দেরি লাগে না। তখনই চোখে পড়ে দিকশূন্যপুর। গাছ-পালার ফাঁকে-ফাঁকে ছোটছোট বাড়ি। চোখ জুড়িয়ে গেলেও বুকটা আকুলি বিকুলি করে, মনে হয় আর দেরি করতে পারছি না, পাখির মতন উড়ে যাই।

কোনো অপ্সরীর ভুল করে ফেলে যাওয়া অলংকারের মতন নিঃশব্দে পড়ে আছে নদীটা, ওর নামও চন্দ্রহার। এই বর্ষায় কিছুটা জল হয়েছে। নদী কি তার গর্ভের নাম না জলের নাম ? সুবর্ণরেখায় যখন একটুও জল থাকে না, তখনও তো তার নাম সুবর্ণরেখা।

টিলার এদিকটা বড় খাড়াই, পা টিপে টিপে নামতে হয়। কাঁটা ঝোপ। কয়েক রকম ক্যাকটাসও আছে এখানে, কিন্তু একটাতেও ফুল ফোটেনি। কোনো একটা ঝোপের মধ্যে সরসর শব্দ হতেই থমকে দাঁড়ালুম। বাঁশী আগেই ব্যাগে ভরে রেখেছি, সেই সাপটা নাকি ?

সাপ নয়, একটা ধূসর রঙের বেজি। তার গায়ে সিল্কের মসৃণতা। তার শরীর বিভঙ্গ যেন চিত্রার্পিত গতি।

ঝোপ থেকে বেরিয়ে বেজিটা আমার দিকে ফিরে একদৃষ্টে চেয়ে রইলো।

আমি কুর্নিশ জানিয়ে বললুম, ওহে, নকুল, তুমি কি দ্বাররক্ষী ? আমি পরিচিত মানুষ, আমায় যেতে দাও !

বেজিটি তবু নড়ে না। মনে হয় যেন সে আমার কাছ থেকে পাস ওয়ার্ড বা মন্ত্রগুপ্তি শুনতে চায়।

আমি গলা ফুলিয়ে, ভাবগম্ভীর স্বর আনার চেষ্টা করে বললুম, স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ...।

ঠিক শূন্যে উড়ে যাবার ভঙ্গি করে বেজিটা স্যাঁৎ করে মিলিয়ে গেল পাশের ঝোপে। এমন মনে করা যেতে পারে যে আমার কথা শুনেই সে পথ ছেড়ে দিল। যা তা কথা তো বলিনি, একেবারে বেদবাক্য ঝেড়ে দিয়েছি !

বেজির বদলে ময়ূরের দেখা পেলে ভালো হত, ময়ূর সম্পর্কে আমার ভালো ভালো কবিতা ও গানের লাইন জানা ছিল। বেচারা বেজিকে নিয়ে কবি-টবিরা তো দূরে থাক, মুনি-ঋষিরাও বোধহয় কিছু লেখেননি।

আগেরবার চন্দ্রহার নদী হেঁটেই পার হয়েছি, এবারে মনে হল বেশ জল।

আশা করেছিলুম, নদীর ওপারে কারুকে দেখতে পাব। ছবি আঁকার জন্য বসন্ত রাও তো প্রতিদিনই নদীর ধারে আসে। কিন্তু আজকের এত বেশি সাদা রোদ বোধহয় ছবি আঁকার পক্ষে প্রশস্ত নয়।

একটা কাজ করা যেতে পারে। পাজামা-পাঞ্জাবি খুলে ব্যাগে ভরে, সেই ব্যাগটা এক হাতে উঁচু করে, অন্য হাতে সাঁতরে পার হবার তো অসুবিধে কিছু নেই। ছেলেবেলায় এ রকম অনেকবার করেছি। নগ্নতার জন্য লজ্জা পাবারও কারণ নেই, কেউ দেখছে না। অবশ্য আকাশ দেখবে, পাহাড়-জঙ্গল-নদী ও বাতাস দেখবে, কিন্তু জামা-কাপড় পরা মানুষ তো ওরা দেখছে এই সেদিন থেকে, মাত্র চার-পাঁচ হাজার বছর।

আঃ, কী ঠাণ্ডা, নির্মল জল। সারা শরীরে যেন মোহময় আদর অনুভব করলুম। কোমর থেকে বুক জল এলো, এখনো হেঁটে যেতে পারছি, পাহাড়ী নদী তাই কাদা নেই, রূপোলি জলের স্রোতের মধ্যে ছোট ছোট মাছ।

ঠাণ্ডা জলের মধ্যে নামলেই হিসি পেয়ে যায়। গঙ্গায় নাইতে নেমে আমি কতবার হিসি করেছি, কিন্তু আমার এই প্রিয় ছোট নদীটিকে আমি অপবিত্র করবো না। বুক জল ছাড়ালো না বলে সাঁতার কাটতে হল না, তবু আমি ডুব দিয়ে মাথা ভেজালুম।

অন্য পারে উঠে গা মাথা মুছে নেবার পর একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেললুম। আমি দিকশূন্যপুরে পৌঁছে গেছি। এখানে আসবার অন্য আরও রাস্তা আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু আমার এই পথটাই পছন্দ।

পৌঁছে যখন গেছি, তখন আর তাড়া নেই। একটা সিগারেট ধরিয়ে ধীরে সুস্থে এগোনো যায়।

নদীর এপাশটায় এবড়ো খেবড়ো উঁচু পাথরের প্রাচীরের মতন হয়ে আছে। মাঝখানে মাঝখানে সুঁড়ি পথ। একটা বড় পাথরের চাঙে কেউ ছেনি মেরে মেরে একটি বিরাট মানুষের মূর্তির আদল গড়েছে। প্রথমটায় চমকে উঠলুম, আমারই মূর্তি নাকি ? তারপর ভালো করে দেখলুম, না, এর মুখে রয়েছে সামান্য দাড়ি এবং তলোয়ারের রেখা।

পাথরের দেয়াল পার হবার পর চোখে পড়ল একটা হলুদ সর্ষের ক্ষেত। এটাও যেন একটা আঁকা ছবি। কারণ ক্ষেতটি চতুষ্কোণ বা গোল নয়, বিশাল ক্যানভাসে জল রঙে আঁকা নদীর মতন। আগেরবার আমি এখানে সর্ষের ক্ষেত দেখিনি।

সেটাকে পাশ কাটিয়ে একটি তরুণ শাল জঙ্গলের মধ্যে ঢুকবার পর চোখে পড়ল প্রথম বাড়িটি। টালির ছাদ দেওয়া বাংলো। সামনের চাতালে একটি

টিউব ওয়েল। সেই টিউব ওয়েলের জল দিয়ে একটি গরুকে স্নান করাচ্ছেন শর্টস ও গেঞ্জি পরা একজন মধ্যবয়স্ক পুরুষ। খুব যত্ন করে তিনি গরুটির গা ঘষে দিচ্ছেন।

আমি একটু দূরে দাঁড়িয়ে ডাকলুম, তপনদা!

তিনি চমকে মুখ তুললেন, তারপরই খুশির হাসি ছড়িয়ে গেল সেই মুখে। তিনি বললেন, নীলু? এসো, এসো! কখন এলে?

আমি বললুম, ভালো আছেন, তপনদা? আমি এই মাত্র পৌঁছেছি। পরে আসব।

—এসো না। একটু বসে যাও। অনেক কথা আছে।

—বিকেলে আসবো তপনদা। আগে এক জায়গায় যেতে হবে।

—জানি, কোথায় যাবে। ও বেলা ঠিক এসো কিন্তু!

খানিকটা এগুতেই দেখি একটা বড় মহুয়াগাছের নিচে তুলি ক্যানভাস নিয়ে বসন্ত রাও খুব গভীরভাবে মগ্ন। গাছতলাটায় ছায়া ছায়া। আলো আসছে উত্তর দিক থেকে।

নিঃশব্দে তাঁর পেছনে গিয়ে দাঁড়ালুম।

এখনো এ ছবিতে কোনো মূর্তি আসেনি, বসন্ত রাও শুধু চাপিয়ে যাচ্ছেন রং। বোধহয় আমার সামান্য ছায়া পড়েছে, তাতেই মুখ ফিরিয়ে তাকালেন।

—নীলু! হোয়াট আ প্লেজান্ট সারপ্রাইজ! তুমি আমাদের জন্য বাইরের দেশের খবর এনেছো?

—কেমন আছো বসন্ত ভাই?

—খাসা আছি, উত্তম আছি, মনোরম আছি। তুমি কিছু কহানী শুনাও!

—পরে গল্প হবে। তুমি কিসের ছবি আঁকছো?

—কী জানি। আপনা আপনি যা গড়ে ওঠে। রং থেকে রেখা আসে। রেখা থেকে আয়তন। তারপর আসে স্বর্গ কিংবা নরক। মাঝখানের পৃথিবীটা সহজে আসতে চায় না। বাস্তবের জন্য ধেয়ান করতে হয়!

বাস্তবের জন্য ধেয়ান করতে হয় শুনে আমার মজা লাগলো। চোখের সামনে যা দেখি, তাই-ই তো বাস্তব। চোখ বুজে ধ্যান করতে হয় তো অতীন্দ্রিয় কিছুর জন্য। কিন্তু বসন্ত রাও না বুঝে-সুঝে কিছু বলেন না। শিল্পীদের কথা বোঝা শক্ত।

বসন্ত রাও মধ্যপ্রদেশের মানুষ, কোথায় বাংলা শিখেছেন কে জানে। কিন্তু ওঁর ভাষা বড় মিষ্টি। টানা টানা চোখ দুটি সব সময় সজল মনে হয়।

দু'জনে কথা বলছি, এমন সময় একটা প্রজাপতি উড়তে উড়তে এসে

ক্যানভাসের ওপরে বসলো।

আমি হেসে বললুম, দ্যাখো দ্যাখো বসন্ত ভাই, তোমার ছবির ওপর একটা বাস্তব নিজে থেকে চলে এসেছে। তোমার ছবিতে ওর দাবি আছে।

বসন্ত রায় ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বললো, চুপ। তারপর এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো প্রজাপতিটির দিকে।

প্রজাপতিটি চঞ্চল ভাবে কয়েকবার ডানা খুললো, বন্ধ করলো, তারপর পরিপূর্ণ ভাবে মেলে স্থির হলো।

বসন্ত রাও ফিসফিস করে বললো, এই পতঙ্গটাকে দ্যাখো। একটা উড়ন্ত পোকা, মাত্র দু'চারদিনের জীবন, অথচ কী সুন্দর, কী নরম, কত নিখুঁত বর্ণমালা, কত যত্ন নিয়ে আঁকা, কোনো ভুল নেই। একে এমন সুচারু নিখুঁতি করে কে বানালো নীলু?

আমি মুচকি হেসে বললুম, তোমাদের মধ্যপ্রদেশে তার নাম ভগবান। আমরা বাংলায় বলি প্রকৃতি!

—কেন রে ব্যাটা, আমাদের মধ্যপ্রদেশের বুঝি প্রকৃতি নেই? না ঠাট্টা নয়, নীলু, এত পলকা একটা প্রাণী, কত ক্ষণস্থায়ী তবু এত সুন্দর কেন? সুন্দর কি এত অপ্রয়োজনীয়?

—ফুলও তো একদিন দু'দিনে ঝরে যায়। একটা গোলাপ যখন কুঁড়ি থেকে ফুল হয়, তখন সেটা বিস্ময়কর নির্মাণ মনে হয় না? অথচ মোটে দু'একদিনের মামলা!

—হাঁ, এ নিবন্ধে কথা আছে। আমি অনেক ভেবেছি। আমরা ফুল দেখে মুগ্ধ হই, ছবি আঁকি, কবিতা লিখি, ফুলের গান গাই, কিন্তু কোনো ফুলই তা জানে না। ফুল কখনো মানুষের জন্য সাজে না, মানুষকে তোয়াক্কাই করে না। ফুল যে এত রং মেখে সুন্দরী হয় তা এই সব পতঙ্গ, কীট, পোকা মাকড়ের জন্য।

—সেটা সত্যি কথা। এই সব পোকা-মাকড়রা কি রং চেনে? ছবি বোঝে?

—আলবাৎ বোঝে। তুমি ভাবো, এক জায়গায় যদি দশ-বারো রকমের ফুল ফুটে থাকে, সেটা আসলে কী? একটা জীয়ন্ত ছবির একজিবিশান নয়? এই সব পোকা-মাকড়রা ধেয়ে আসে সেই প্রদর্শনী দেখতে, ঘুরে ঘুরে বিচার করে, তারপর যার যেটি পছন্দ তার মুখে চুমা দেয়। সব ফুল এত সাজসজ্জা করে শুধু কোনো প্রেমিকের মন পাবার জন্য, এই সব প্রেমিক। মানুষ নয়, মানুষ তো ফুলকে গর্ভবতী করতে পারবে না। হায় হায়, নীলু, সব মানুষই ফুলের কাছে উপেক্ষিত, অনাদৃত, ব্যর্থ প্রেমিক!

দূরে একটা ছায়া দেখে আমি চোখ তুলে তাকালুম।

কালো শাড়ী পরা একজন রমণী একা একা হেঁটে আসছে এই দিকে। তার গায়ের রং গৌর, কালো শাড়ীটির জন্য আরও ফর্সা দেখায়। মাথায় চুল খোলা, খালি পা।

এই রমণীকে আমি আগে দেখিনি।

সেই কৃষ্ণবসনা এদিকে আমাদের দিকে চেয়ে আসতে আসতে হঠাৎ এক জায়গায় থমকে দাঁড়ালো। তারপর পাশ ফিরে তাকালো একটা সোনাঝুরি গাছের দিকে।

আমি বসন্ত রাও-কে জিজ্ঞেস করলুম, ইনি কে?

বসন্ত রাও মুখ তুলে বললো, জানি না। এক-দু' হপ্তা হলো এসেছেন, কেউ এখনো এর নামটি পর্যন্ত জানে না। ইনি কথা বলেন না। কিন্তু বোবা নন, মাঝে মাঝে গলায় সুর শোনা যায়, সেই সুরে কোনো ভাষা নেই।

—উনি এই জায়গার সন্ধান পেলেন কী করে?

—কী জানি! আমরা প্রাইভেটলি ওঁর নাম দিয়েছি আকুলা রাই।

—সব সময় কালো পোষাক পরেন?

—হ্যাঁ। শোনো, নীলু, তুমি ওঁর সঙ্গে কিন্তু যেচে কথা বলতে যেও না। আমাদের এখানকার নিয়ম জানো তো? কেউ নিজে থেকে পরিচয় না দিলে আমরা জিজ্ঞাসিত হতে পছন্দ করি না। বাতাস, জল, আকাশের মতন স্বাভাবিক বলে মেনে নিই।

প্রজাপতিটা উড়ে গেছে। আমি বললুম, আবার পরে দেখা হবে বসন্ত ভাই।

কৃষ্ণবসনা যেখানে দাঁড়িয়ে, তার পাশ দিয়েই আমাকে যেতে হবে। বসন্ত রাও তাকিয়ে রইলো আমার যাওয়ার পথের দিকে। আমি নিয়মভঙ্গ করি কিনা দেখবার জন্য। আমি দেবর লক্ষ্মণের মতন শুধু মহিলার পা দুটির দিকে তাকিয়ে হাঁটতে লাগলুম। ওর পায়ে ফাটা দাগ নেই, এমনিই সাধারণ যত্নে রাখা মেয়েদের পা, পায়েল বা অন্য কোনো অলঙ্কারও নেই, তবু কেন যেন আমার মনে হলো, এই নারী আগে চিত্রতারকা ছিল!

অন্য বাড়িগুলোর কাছাকাছি কোনো মানুষজন আর দেখতে পেলুম না। না দেখাই ভালো, এখন আর থামা যেত না। আমার বেশ খিদে পেয়েছে।

একটা ছোট্ট টিলার গায়ে কয়েকটি বাড়ি। আমাকে পৌঁছোতে হবে একেবারে টঙে।

প্রথম বাড়িটির সামনে একটা বেশ বড় কুয়ো। উঁচু করে পাড় বাঁধানো। ভারি সুস্বাদু জল। এখান থেকেই অনেকে জল নিতে আসে। এখন কেউ নেই।

কুয়োটা পেরিয়ে আমি চলে যাচ্ছিলুম, হঠাৎ মনে পড়লো আমি নিয়মভঙ্গ করছি।

কুয়োর ধারে দুটি লাল টুকটুকে পলিথিনের বালতি রয়েছে, খালি। এখানকার প্রথা হচ্ছে, পথ-চলতি কেউ ওরকম খালি বালতি দেখলে ভরে দিয়ে যাবে। কারুর তো জল তোলার অসুবিধে থাকতে পারে।

ফিরে এসে আমি দড়ি-বাঁধা বালতি নামিয়ে দিলুম কুয়োর জলে। যে-ছোট বালতি ফেলে জল তোলা হয়, সেটার আলাদা একটা নাম থাকা উচিত। যে-হাতি দিয়ে অন্য হাতি ধরা হয় তার যেমন নিজস্ব নাম আছে। আমি এই বালতিটার নাম দিলুম ডুবুরি। ওরে, ডুবুরিটা কোথায় গেল? এই যাঃ, ডুবুরিটা দড়ি ছিঁড়ে পড়ে গেল! ডুবুরি তোলবার জন্য এবার ডুবুরি ডাকতে হবে!

প্রথমে ঠাণ্ডা জলে আমি মুখ হাত ধুয়ে নিলুম। একটু তেষ্টা থাকলেও পান করলুম না, এই জল সাঙ্ঘাতিক হজ্‌মি, এখন আমার খালি পেট, নাড়ি-ভুঁড়ি হজম করে দিতে পারে।

দুটি লাল বালতি ভরা হতেই পাশের বাড়ি থেকে এক বৃদ্ধ আস্তে আস্তে হেঁটে আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন। মাথার চুল সব সাদা। পরনে সাদা পায়জামা ও পাঞ্জাবি, হাতে একটি ছড়ি। এঁকেও আমি আগে দেখিনি।

বৃদ্ধটি ধীর স্বরে বললেন, দু'দিন জ্বর হয়েছিল, আমার হাতের জোর কমে গেছে।

আমি বললুম, নমস্কার। আমার নাম নীললোহিত। আমি আজই এখানে এসে পৌঁছেছি।

বৃদ্ধ হাত তুলে বললেন, শুভমস্তু।

এই ধরনের আশীর্বাদ পাওয়ার অভ্যেস নেই আমার। এখানেও আগে শুনিনি। এর উত্তরে কী বলতে হয় আমি জানি না।

বৃদ্ধ বললেন, তুমি বালতি দুটো আমার বাড়ির মধ্যে পৌঁছে দেবে?

আমি বললুম, নিশ্চয়ই।

সদর দরজা পেরিয়ে একটা ছোট উঠোন, তার এক পাশে রান্নাঘর। সেই রান্নাঘরের সামনে আমি বালতি দুটি নামিয়ে রাখলুম। বৃদ্ধ আমার সঙ্গে সঙ্গে এসেছেন, তিনি বারান্দায় একটি চেয়ার দেখিয়ে বললেন, বসো।

আমি বললুম, এখন নয়, পরে এক সময় আসবো।

উনি আবার বললেন, বসো। একটু বসো।

এবারে আমি বিনীত দৃঢ়তার সঙ্গে বললুম, মাপ করবেন, এখন আমার বসার নিষেধ আছে।

বৃদ্ধ আমার চোখের দিকে তাকিয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর রান্না ঘরের কাছে গিয়ে পা দিয়ে জলের বালতি দুটো উল্টে দিয়ে বললেন, ঠিক আছে, যাও!

এই বুড়োটা ক্ষ্যাপা নাকি? আমার হাসি পেয়ে গেল।

আমি বললুম, আপনি রাগ করলেন, কিন্তু সত্যি আমার এখন বসার উপায় নেই।

বৃদ্ধ ছড়ি তুলে হুকুমের সুরে বললেন, যাও!

কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, আমি পিঠ ঘোরালাম। বালতি বয়ে দিয়েছি বলে উনি বোধহয় বিনিময়ে আমাকে কিছু খেতে-টেতে দিতে চাইছিলেন। কিংবা একাকীত্ব অসহ্য লাগছে, তাই খুঁজছিলেন একজন কথা বলার সঙ্গী। কিন্তু সঙ্গী নির্বাচনে ওঁর ভুল হয়েছে।

এই ভর-দুপুরে মুর্গী ডেকে উঠলো যেন কোন্ বাড়িতে।

আমি টিলার গা দিয়ে দৌড়ে দৌড়ে উপরে উঠতে লাগলুম। আগের দিন বৃষ্টি হয়ে গেছে, তাই কোথাও রুক্ষতা নেই।

কালো শাড়ী পরা মহিলাটির পা-দুখানির কথা মনে পড়ছে। আমি ওর মুখ ভালো করে দেখিনি। দিনের বেলা চড়া রোদের মধ্যে ঐ রকম মিশমিশে কালো শাড়ী পরে ঘুরতে আমি আগে কখনো দেখিনি। কী রকম যেন অপ্রাকৃত লাগে। মনে হয় হঠাৎ মিলিয়ে যাবে।

একেবারে পৌঁছোলুম বাড়িটার পেছন দিকে। এটাও দু'খানা ঘরের বাড়ি, টালির ঢালু ছাদ। কোনো জানলাতেই পর্দা নেই। এখানে সূর্য ছাড়া আর কেউ জানলা দিয়ে উঁকি মারে না।

ছাদের ওপর একটা শঙ্খচিল চুপ করে বসে আছে। তার ঠোঁটেরই মতন তার দৃষ্টি। যেন সে এই বাড়ির পাহারাদার। চিলের মতন এত সুন্দর শরীর-সৌষ্ঠব আর খুব কম পাখিরই আছে, কিন্তু বেচারাদের গলায় আওয়াজটা বড় দুর্বল।

ঘুরে এলুম সামনের দিকে। একটা ছোট মতন বাগান। এক পাশে ফুল। অন্য পাশে কিছু না কিছু তরকারির চাষ হয়। গতবারে দেখে গিয়েছিলুম পেঁয়াজ কলি, এবারে দেখছি বেগুনের খেত। বেশ নধর বেগুনি রঙের বেগুন ফলেছে। বন্দনাদি একটা ঝাড়ি নিয়ে জল দিচ্ছেন সেই ক্ষেতে।

কলকাতা ছাড়বার পর বন্দনাদিকে আমি শাড়ী পরতে দেখিনি। তাঁর পোশাক অনেকটা বেদেনীদের মতন, এই পোশাক বন্দনাদি নিজেই তৈরি করে নেয়। কোমরের নিচে একটা ঘাগড়া, মনে হয় যেন গাছের পাতা শেলাই করা। ওপরে একটা টাইট জামা, হাত-কাটা, চার পাশে লেস বসানো। মাথায় একটা লাল

রঙের ফেট্টি।

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে বন্দনাদিকে দেখতে লাগলুম।

কিন্তু পুরুষ মানুষদের উপস্থিতির একটা উত্তাপ আছে। মেয়েরা ঠিক টের পেয়ে যায়। হঠাৎ পেছন ফিরে বন্দনাদি বললো, কে?

আমায় দেখে মোটেই অবাক হলো না। ভুরু তুলে বললো, নীলু? আমি ঠিক জানতুম, তুই দু'একদিনের মধ্যে আসবি।

বাগানে ঢুকে এসে আমি জিজ্ঞেস করলুম, তুমি আমায় ডেকেছো, তাই না?

হাতের ঝাড়িটা নামিয়ে রেখে বন্দনাদি আকাশের দিকে তাকালো। তারপর সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে বললো, আজকের দিনটা খুব সুন্দর।

এতক্ষণে আমার দিকশূন্যপুরে ঠিকঠাক পৌঁছোনো হলো।

॥ ৩ ॥

শুধু ডিমসেদ্ধ আর ফ্যানা ভাতে আমার চমৎকার চলে যেত, কিন্তু অমন নধর বেগুন দেখে মনে হলো, বেগুন ভাজা খেতেই হবে।

ক্ষেত থেকে একটা বড় বেগুন ছিঁড়ে এনে বন্দনাদি বললো, তুই ভাজতে পারবি। আমি তা হলে চট করে চানটা করে আসি!

বেগুন ভাজতে ধৈর্য লাগে। এখানে আমার খিদে ছাড়া ব্যস্ততা কিছু নেই। অ্যালুমিনিয়ামের কড়াইতে তেল চড়িয়ে আমি বেগুনটা ধুয়ে চাকলা চাকলা করে কেটে ফেললুম। তারপর একটু হলুদ আর নুন মেখে অপেক্ষা। আনাড়ি রাঁধুনি হলে এক্ষুনি বেগুন ছেড়ে দিত তেলে। তেল গরম হয়ে চড়বড় শব্দ হচ্ছে, কিন্তু শেষ বুড়বুড়িটুকু মিলিয়ে না-যাওয়া পর্যন্ত ভাজার জিনিস ছাড়তে নেই। একটু পরে আঁচ কমিয়ে দিতে হয়। উল্টে দিতে হয় বারবার। বেশ লালচে অথচ নরম-নরম ভাজা হবে, পুড়ে কালো হয়ে যাবে না, এটাই তো আসল কৃতিত্ব।

বন্দনাদি স্নান সেরে আসতে আসতে আমি প্লেট-গেলাস সাজিয়ে প্রস্তুত। মেঝেতে বসেই খাওয়া, আসনের বালাই নেই, এখানে খবরের কাগজও আসে না।

বন্দনাদি এসে বসে পড়ে বললেন, তোর মতন একজন রাঁধুনি পাওয়া গেলে বেশ ভালো হতো। আমার নিজের জন্য রান্না করতে একদম ভালো লাগে না।

—রাখো না আমাকে। শুধু খোরাকি দিলেই চলবে। আমি দুর্দান্ত খিচুড়ি আর আলুর দম রাঁধতে পারি। আর চিংড়ি মাছ পোস্ত দিয়ে...

—দূর, চিংড়ি মাছ এখানে পাওয়াই যায় না। কতদিন খাইনি!

প্রথম গেরাসটি মুখে তুলতে গিয়েও থেমে গেল বন্দনাদি। আমার দিকে সরল রেখায় চেয়ে রইলো, তারপর খুব লজ্জা লজ্জা কাতর গলায় জিজ্ঞেস করলো, নীলু, তুই এর মধ্যে বেকবাগানে গিয়েছিলি?

—কাল সকালেই গিয়েছিলুম। যেই মনে হলো এখানে আসবো, অমনিই···

—নীলু, তুই একশোটার মধ্যে একশো দশটা মিথ্যে কথা বলিস, আমি জানি।

—তোমার কাছে অত নয়। ফিফটি ফিফটি। তার মধ্যে প্রথম পঞ্চাশটা নিখাদ সত্যি। কালকেই রূপসার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। খুব চমৎকার আছে।

হাতের গেরাস হাতেই রইলো, বন্দনাদি অন্যমনস্ক হয়ে গেল। তার মুখে ফুটে উঠলো মাতৃত্বের ছায়া।

আমি আর খিদের দাপট সহ্য করতে পারছি না, খাওয়া শুরু করে দিলুম। বন্দনাদি বেশ শক্তিশালিনী রমণী। শুধু মনের জোর নয়, গায়ের জোরও যথেষ্ট। পাহাড়ী নারীদের মতন। দু' ঘণ্টা একটানা মাটি কোপাতে দেখেছি বন্দনাদিকে। এই বেগুন ক্ষেতটিতেও তো বন্দনাদির একার পরিচর্যাতেই এমন ফসল ফলেছে। সেই বন্দনাদিই ছোট্ট একটা মেয়ের জন্য একেবারে দুর্বল হয়ে যায়।

—নীলু, তুই যখন ওকে দেখতে গেলি, ও কী করছিল?

—ও তখন সেজেগুজে দুই দিদির সঙ্গে ইস্কুলে যাচ্ছিল।

—কোন্ ইস্কুলে পড়ে?

এর উত্তরটা আমি ঠিক জানি না। কিন্তু এখানে একটা সাদা মিথ্যে বললে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না।

—জানো তো আজকাল ছেলে-মেয়েদের ভালো ইস্কুলে ভর্তি করা কত শক্ত। বিয়ের আগে নাম রেজিস্ট্রি করাতে হয়। কিন্তু তুমি খুব লাকি, তোমার মেয়ে মডার্নে চান্স পেয়েছে। বেস্ট স্কুল!

—ওখানে তো বড্ড পড়ার চাপ শুনেছি?

—কে বলেছে? তাহলে ওরকম হাসতে হাসতে স্কুলে যায়? রূপসা গানও শিখতে শুরু করেছে শুনলুম। আচ্ছা, তোমাদের এখানে ইস্কুল নেই?

—ইস্কুল? তুই পাগল হয়েছিস? এখানে ইস্কুল থাকতে যাবে কেন?

—এবারে তুমি খেয়ে নাও!

—তুই এসে পড়েছিস, খুব ভালো হয়েছে। আজ দুপুরে নুন ভাঙতে যাবো!

খেয়ে ওঠবার পর আমি একটা সিগারেট ধরাতেই বন্দনাদি বললো, অ্যাই, এখানে সিগারেট খাওয়া নিষেধ, তুই জানিস না?

—কিন্তু আমি তো বাইরের লোক।

—তা হলেও চলবে না।

—ভাত খাবার পরে শুধু একটা!

—দে, ওটা আমাকে দে!

বন্দনাদি আমার হাত থেকে সিগারেটটা কেড়ে নিয়ে প্রথমে নিজে একটা টান দিল বেশ জোরে, তারপর সেটা মাটিতে ফেলে খালি পায়েই চাপতে লাগলো। পায়ের সেই ভঙ্গি দেখেই বোঝা যায় বন্দনাদি নাচতো একসময়। কলামন্দিরের মঞ্চে আমি বন্দনাদিকে 'শকুন্তলা' নৃত্যনাট্যে শকুন্তলার ভূমিকায় নাচতে দেখেছি। তার রূপ ও গুণের দারুণ গ্ল্যামার ছিল তখন। সেই বহুজনবাঞ্ছিতা বন্দনা রায় এখন একটা টিলার ওপরে একলা থাকে। নাচের বদলে বেগুন ক্ষেতে কোদাল চালায়। রোদে পুড়ে ফর্সা মুখখানা অনেকটা তামাটে হয়ে গেছে।

বন্দনাদি বললো, আমি তোর সিগারেটটা একবার টানলুম কেন জানিস? ওর মধ্যে যেন খানিকটা শহরের গন্ধ পেলুম। অনেকদিন বাদে।

—তোমার মন কেমন করে বন্দনাদি?

—মোটেই না! অনেকদিন পর আকাশ দিয়ে একটা বেলুন উড়ে যেতে দেখলে যেমন ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে। তাবলে কি ছেলেবেলার জন্য মন কেমন করে নাকি? চল, চল, বেরিয়ে পড়ি।

বাইরের রোদ এখন আর তেমন মিষ্টি নয়, বরং বেশ ঝাঁঝালো। খেয়ে উঠেই এমন রোদের মধ্যে বেরুবার উৎসাহ এখানে আসার পরই অর্জন করেছে বন্দনাদি। কলকাতায় প্রায় সব সময়েই গাড়িতে ঘুরতো।

রবারের চটিটা আমি খুলে রাখলুম। এখানে সবাই খালি পায়ে হাঁটে। শুনেছি নুডিস্ট কলোনিতে জামা-কাপড় পরা লোকদেরই অশ্লীল দেখায়।

সরঞ্জামের মধ্যে বন্দনাদির হাতে একটা ভারি লোহার শাবল। টিলা থেকে নামতে শুরু করলুম আমরা দু'জনে। আসবার পথে যেখানে কুয়োটা দেখেছিলুম তার উল্টো দিক দিয়ে।

—কুয়োর কাছে একজন রাগী বুড়ো থাকে, ও কে বন্দনাদি?

—তুই ওর পাল্লায় পড়েছিলি বুঝি? তারপর কী হলো? তোকে মারতে তাড়া করেন নি তো?

—প্রায় সেই অবস্থা। কে উনি?

—উনি একজন মস্ত বড় অঙ্কের পণ্ডিত। সবাইকে ডেকে ডেকে অঙ্ক শেখাতে চান।

—ওরে বাবা, খুব জোর বেঁচে গেছি তা হলে! আমার মাথায় হাতুড়ি ঠুকলেও অঙ্ক ঢোকানো যাবে না।

—তবে একবার যদি ঘণ্টা দু' এক ধৈর্য ধরে শুনতে পারিস তা হলে চিনতে পারবি আসল মানুষটাকে। জানিস তো, বুড়ো মানুষরা কক্ষনো একা থাকতে পারে না। কারুর সঙ্গে কথা বলতে না পারলে তাদের মুখ চুলকোয়। আসলে একা থাকলে অসহায় বোধ করে। সেইজন্য আমি মাঝে মাঝে যাই ওঁর কাছে। প্রত্যেকবারই টানা দু' ঘণ্টা অঙ্ক বোঝানোর পর হঠাৎ হাত নেড়ে বলতে থাকেন, কিন্তু জীবনের কোনো অঙ্কই মেলে না! জীবনের কোনো অঙ্কই মেলে না! প্রকৃতি বেটী মহা ধুরন্ধরী! মহা ধুরন্ধরী!

প্রকৃতি সম্পর্কে অ্যাডজেকটিভটা আমার ভালো লাগলো। পরে কোথাও কাজে লাগিয়ে দিতে হবে! এই রকম আর একটা কোথায় যেন পড়েছিলুম, অঘটনঘটন পটিয়সী। এটা কার সম্পর্কে প্রযোজ্য, প্রকৃতি না নিয়তি? ঠিক মনে নেই। পটিয়সীর মতন একটা চমৎকার শব্দ আমি এখনো কোথাও ব্যবহার করতে পারিনি।

টিলার নিচটায় এদিকে বেশ জংলা মতন জায়গা। তারপর ছোট ছোট ঢিবি ও জঙ্গল। হঠাৎ দেখলে মনে হয় এই জঙ্গলটা এমনই নিবিড় ও আদিম ধরনের যে এখানে কোনোদিন মানুষ প্রবেশ করে নি। তা অবশ্য ঠিক নয়। মানুষ নিয়মিতই আসে এখানে।

একজন নারী ও পুরুষ একটু দূরে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে এমন ভাবে কথা বলছে, যাতে ওদের প্রেমিক-প্রেমিকা মনে হয় না, মনে হয় স্বামী-স্ত্রী। দু'জনেই মধ্যবয়েসী। আমি একটু অবাক হলুম। এখানে তো সাধারণত একসঙ্গে দু'জন থাকতে আসে না। স্বামী-স্ত্রীর তো প্রশ্নই নেই।

—বন্দনাদি, এরা?

—এরা তো অনেকদিন আছে। তুই আগে দেখিস নি বুঝি?

—স্বামী-স্ত্রী?

—না, না, তা কেন হবে। দু'জনে আলাদা আলাদা এসেছিল। এখানে বুঝি কারুর সঙ্গে কারুর ভাব হয় না? ভাব হলে তারা বিয়ে করতে পারে, কিংবা এমনিই একসঙ্গে থাকতে পারে।

—বন্দনাদি, তোমার সঙ্গে কারুর ভাব হয়নি? তোমাকে কেউ বিয়ে করতে চায়নি?

বন্দনাদি একগাল হেসে বললো, হ্যাঁ। একজন তো আমায় প্রায়ই বিয়ে করতে চায়। কে বল তো? ঐ কুয়োর ধারের অঙ্ক-পাগল বুড়ো!

—ওরে বাবা! বুড়ো লোকরা তো নাছোড়বান্দা হয়। তুমি ওকে ফেরাও কী করে?

—আমি দু'হাত নাড়তে নাড়তে বলি, জীবনের এ অঙ্কটাও মিলবে না! মিলবে না!

—বন্দনাদি, তোমার সুরঞ্জনের কথা মনে পড়ে না?

বন্দনাদির হাসিখুশি ভাবটা সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে গেল, আমার দিকে খর চক্ষে তাকিয়ে বললো, সে কে?

—আহা হা, বেশি বাড়াবাড়ি করছো। সুরঞ্জন একসময় তোমার প্রচণ্ড বয় ফ্রেণ্ড ছিল, তাকে তোমার একেবারেই মনে নেই বলতে চাও?

আমার গালে একটা ধারালো চাঁটি কষিয়ে বন্দনাদি বললো, অসভ্য ছেলে, তোকে বলেছি না ওসব কথা এখানে কখনো উচ্চারণ করবি না? এখানকার টাটকা বাতাসে নিঃশ্বাস নিয়ে মনটাকে পরিষ্কার করতে পারিস না? তোদের ঐ পচা-গলা কলকাতার দূষিত চিন্তাগুলো এখানে এসেও ভুলতে পারিস না?

আমি দু'দিকে মাথা নেড়ে বললুম, না, পারি না।

সেই নারী ও পুরুষ যুগল এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ে তর্কাতর্কি করছে। আমরা তাদের পাশ কাটিয়ে অন্যদিক দিয়ে এগিয়ে গেলুম। আমার কানে এলো ওদের দু-একটি কথার টুকরো, তুমি কী চাও তা তুমি বোঝো না....আমি যা বুঝি তাই-ই আমি চাই....চাওয়া আর বোঝা এক কথা নয়....আমি জীবনটাকে এক কথায় বুঝতে চাই না....জীবন তো বোঝার জিনিস নয়, নিশ্বাস ফেলার নাম জীবন....এমন অনেক কিছুই আছে যার কোনো নাম নেই....

এ কী অদ্ভুত তর্ক? একেই বলে বোধহয় সান্ধ্যভাষা!

বন্দনাদি বেশ অন্যমনস্ক হয়ে গেছে। থুতনি উঁচু করে চেয়ে আছে সামনের দিকে। চোখ যা দেখছে এখন তা আসলে চোখের সামনে নেই।

গতবারের তুলনায় বন্দনাদির স্বাস্থ্য অনেক নিটোল, সুগোল হয়েছে। বুক দুটি পরিপূর্ণ। হায়, ঐ বুকে কোনো পুরুষ মাথা রাখে না, কোনো শিশু ওষ্ঠ ছোঁয়ায় না।

আমার সেজবৌদির সঙ্গে একসঙ্গে কলেজে পড়তো বলে আমি ছোটবেলা থেকেই ওকে বন্দনাদি বলি। কিন্তু আমার সঙ্গে ওর বয়েসের তফাৎ দু-তিন বছরের বেশি নয়। ওকে দিদি বলার কোনো মানেই হয় না, কিন্তু ছোটবেলার সম্বোধন বদলানো বড় শক্ত। আর বন্দনাদিও আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করে যেন আমি একটা বাচ্চা। অবশ্য ততটা বাচ্চা নয়, যাতে আমি ওর বুকে ওষ্ঠ ছোঁয়াতে পারি।

আমার কাছে এক লক্ষ টাকা থাকলে আমি সেটা বাজি ধরে বলতে পারতুম, বন্দনাদি এখন সুরঞ্জন নামে একটা উড়নচণ্ডীর কথাই ভাবছে। হয়তো প্রেমে নয়, পরিতাপে নয়, বিতৃষ্ণায়।

একমাত্র রূপসা ছাড়া বন্দনাদি কলকাতার আর কারুর কথা কক্ষনো জিজ্ঞেস করে না। এমনকি নিজের দিদি-জামাইবাবুর কথাও না। তবু কি সবাইকে মন থেকে মুছে ফেলতে পেরেছে ?

এদিকে দু-একটা ছাড়া ছাড়া বাড়ি চোখে পড়ে। ভেতরে মানুষজন আছে কি না বোঝা যায় না। জঙ্গলের একেবারে কাছ ঘেঁষা একটা সাদা রঙের বাড়ির দিকে হাত দেখিয়ে বন্দনাদি বললো, দ্যাখ নীলু, এই বাড়িটা খুব সুন্দর না ?

—কে থাকে ঐ বাড়িতে ?

—একজন থাকতো, সে আবার ফিরে গেছে। এখন খালি !

—কেউ এখান থেকে ফিরে যায় তা হলে ?

—যারা বোকা, তারা আবার বোকামি করতে যায়। এখানে যে ছিল সে ফিরে গেল কেন জানিস ? বক্তৃতা করার নেশা ছাড়তে পারে নি। এখানে তো মঞ্চও নেই, শ্রোতাও নেই।

—আর যাদের গান বা নাচের নেশা ?

—তাদের জন্য তো এতবড় আকাশ রয়েছে।

—দু-একজন জ্যান্ত শ্রোতা থাকলেও আপত্তি নেই নিশ্চয়ই। বন্দনাদি, আজ আমি তোমার একটা গান শুনবো।

—তুই ভালো দিনে এসে পড়েছিস। দেখিস আজ সন্ধেবেলা কত মজা হবে।

এই জঙ্গলে হিংস্র জানোয়ার বিশেষ নেই। ক্বচিৎ কখনো দু-একটা ভাল্লুক দেখা গেছে। কিছু হরিণ আছে, অনেক খরগোশ আছে। নানারকম পাখির মধ্যে বিশেষ দ্রষ্টব্য হলো ধনেশ পাখি।

ঝোপ-ঝাড় লতা-পাতার মধ্যে একটা বিশাল সাদা পাথরের চাঁই পড়ে আছে। ঐটাই নুন পাথর। পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে জিনিসটা এমনই বেমানান যে মনে হয় আকাশ থেকে খসে পড়েছে। জন্তু জানোয়াররা জিনিসটাকে ঠিকই চিনতে পেরেছে, তারা এখানে নুন চাটতে আসে। এখন দিকশূন্যপুরের মানুষরাও আসছে।

আমি এই জায়গাটা আগে দেখিনি, শুনেছিলুম। প্রথমে চাঁইটাকে মার্বেল পাথর মনে হয়, কাছে এসে দেখা যায় লালচে লালচে শিরা আছে। গতকালের বৃষ্টির জন্য এখানকার মাটি এখনো ভিজে ভিজে, তাতে অনেক ছাগলের পায়ের

ছাপ। ও, ছাগল তো নয়, হরিণ। পায়ের ছাপ একইরকম। ছাগল আর হরিণের মধ্যে তফাৎ অতি সামান্য, তবু বেচারা ছাগলরা কী একটা অখাদ্য নাম পেয়েছে।

আমি বন্দনাদির কাছে শাবলটা চাইতে সে বললো, না, তুই দ্যাখ আমি কী করে ভাঙি। যেখান সেখান থেকে ভাঙলে চলে না, পাথরটার গোল ভাবটা যেন বজায় থাকে।

—সে রকম রেখে কী লাভ ?

—আর কোনো লাভ নেই, দেখতে সুন্দর থাকবে।

তারপর ভাস্কররা যেমন পাথর কেটে মূর্তি বানায় সেইরকম ভাবে বন্দনাদি এক এক জায়গায় শাবল মেরে খানিকটা করে চাকলা ভাঙতে লাগলো।

তখন আমার মনে পড়লো নদীর ধারের ভাস্কর্যটার কথা। বসন্ত রাও-কে কোনো এক সময় জিজ্ঞেস করতে হবে।

বেশ অনেকগুলো চাকলা ভেঙে পড়বার পর আমি বললুম, ব্যস, ব্যস, আর কী হবে ? এত নুন তুমি সারা জীবনেও খেয়ে শেষ করতে পারবে না !

—মানুষ বুঝি শুধু নিজের জন্যই সব কিছু করে ?

আমি লজ্জা পেয়ে গেলুম। এদের এখানে যে একটা চমৎকার সমবায় ব্যবস্থা আছে, সেটা মনে ছিল না।

ঘাগড়ার পকেট থেকে বন্দনাদি একটা দড়ির থলি বার করলো। তার মধ্যে নুনের চাকলাগুলো ভরে বললো, চল, তোকে আর একটা জিনিস দেখাই।

আমার একটা কিছু করা উচিত বলে আমি বন্দনাদির হাত থেকে থলিটা নিয়ে নিলুম। বেশ ভারি, অন্তত সাত-আট কেজি হবে।

বন্দনাদি আরও গাঢ় জঙ্গলের মধ্যে এগিয়ে চললো। গাছ-কাটা কন্ট্রাকটরদের এখনো এই বনের প্রতি নজর পড়ে নি। তবে কতদিন আর এরকম থাকবে ? খন্তা-কুড়ুল হাতে নিয়ে সভ্যতা এদিকে একদিন ধেয়ে আসবেই।

খানিকটা হেঁটে আমরা একটা জলাশয়ের কিনারায় এসে পৌঁছোলুম। দুটি খরগোশ সরসর করে ছুটে পালালো। ওরা এমনই হুবহু একরকম যে মনে হয় যমজ।

জলাশয়টি গোল বা চৌকো নয়, এবড়ো খেবড়ো, অর্থাৎ প্রাকৃতিক। জলের রং কালো। এক পাঁতি বক উড়ে গেল ওপর দিয়ে। জায়গাটা অদ্ভুত শান্ত। এখানে শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করে।

—এদিকে আয়, নীলু। খুব আস্তে আস্তে, শব্দ করিস না।

ডানদিকে খানিকটা যেতেই চমকে উঠলুম। এই মাত্র এখানে আমার শুয়ে

থাকার ইচ্ছে হয়েছিল, এখানে সত্যিই একজন মানুষ শুয়ে আছে। একটা উঁচু বেদীতে। খাঁকি রঙের প্যান্ট আর সাদা ফতুয়া পরা। মানুষটি বেশ লম্বা। মাথার চুল কাঁচা পাকা।

বন্দনাদি সন্তর্পণে হেঁটে মানুষটির মাথার কাছে দাঁড়ালো। একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে হাত রাখলো তার কপালে। অমনি সে চোখ খুলে মাথা ফেরালো বন্দনাদির দিকে।

বন্দনাদি জিজ্ঞেস করলো, কেমন আছো, নীহারদা ?

লোকটি খুব আস্তে, প্রায় ফিসফিস করে বললো, ভালো আছি, আগের চেয়ে ভালো আছি ! মনে হয় ভালো হয়ে যাবো।

—তুমি উঠবে ? আমি তোমাকে ধরবো ?

—না। আর একটা দিন শুয়ে থাকি।

—তোমার কিছু লাগবে ?

লোকটি আমার দিকে তাকালো। বিন্দুমাত্র কৌতূহল প্রকাশ করলো না। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললো, এই যে তুমি আমার কপালে হাত রাখলে, মনে হলো যেন এটা আমার আগের জন্মে পাওনা ছিল।

বন্দনাদি লোকটির বুকে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো।

লোকটি আবার বললো, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিলাম, আমার বাগানের চন্দ্রমল্লিকা গাছগুলো সব শুকিয়ে গেছে। তুমি আমার বাগানে একটু জল দিও, বন্দনা।

—দেবো।

—যদি অনন্তর সঙ্গে দেখা হয়, বলো, আমি তাকে ক্ষমা করেছি।

—অনন্ত তা জানে, নীহারদা।

—কেউ আমার নাম ধরে এখনো ডাকছে, বড় ভালো লাগলো শুনতে।

—নীহারদা, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো ? যদি আপনার কষ্ট না হয়....

—বলো, বন্দনা।

—নীহারদা, আপনি যে আগেকার জীবনের সব কিছু ছেড়ে দিকশূন্যপুরে চলে এসেছিলেন, সেজন্য কি এখন আপনার অনুতাপ হচ্ছে ?

—না, না, একটুও না। আগেকার কথা ভালো করে মনেও পড়ে না। মনেও পড়ে না।

বলতে বলতে লোকটি চোখ বুজলো। বন্দনাদি একটু দাঁড়িয়ে থেকে তারপর সরে এলো।

—চল নীলু, এবার সন্ধে হয়ে আসছে, জঙ্গল থেকে বেরিয়ে যাই।

—উনি এইখানেই শুয়ে থাকবেন ?

—উনি তো তাই-ই চাইছেন। আমাদের এখানে কারুর শক্ত অসুখ হলে বা খুব শরীর খারাপ হলে তো সেরকম কোনো চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। সেরকম রুগীকে এখানে এনে শুইয়ে দেওয়া হয়। মরার পক্ষে এই জায়গাটা খুব সুন্দর না ?

—তা বলে এরকম একা ? কাছে কেউ থাকবে না ?

—এসব তুই বুঝবি না। তবে এখানে শুইয়ে দেবার পরেও অনেকেই বেঁচে যায়। আবার ফিরে যায়। তোদের হাসপাতাল থেকে ক'জন ফেরে বল ?

—বন্দনাদি, আমারও মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে নাকি ? এই জায়গাটা দেখেই আমার শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করেছিল।

—এক চাঁটি খাবি।

জঙ্গলের মধ্যে যতটা অন্ধকার লাগছিল, বাইরে ততটা সন্ধে হয়নি। শেষ বিকেল বলা যায়। আকাশ বেশ রঙীন।

কয়েক মিনিট আমরা চুপ করে হাঁটতে লাগলুম। মৃত্যুর চিন্তাটা মন থেকে তাড়িয়ে দেওয়া দরকার। একটা জলাশয়ের ধারে গাছ তলায় ঐ লোকটি সারা রাত একা থাকবে··· এমন নিঃসঙ্গতা···। নাঃ, একটা কিছু হালকা কথা বলা দরকার।

—বন্দনাদি, এতটা রাস্তা খালি পায়ে হেঁটে এলে, অথচ তোমার পায়ে একটা কাঁটাও ফুটলো না ? তা হলে বেশ হতো !

—আমার তো খালি পায়ে হাঁটা অভ্যেস হয়ে গেছে। তোর পায়েই বরং কাঁটা বেঁধার চান্স ছিল বেশি।

—দূর, আমার পায়ে বিঁধলেই বা কী, না বিঁধলেই বা কী ! তোমার পায়ে বিঁধলে আমি বেশ তোমার পা-খানা আমার কোলে নিয়ে কাঁটাটা তুলে দিতুম। হাত দিয়ে না উঠলে মুখ দিয়ে দিতুম। তাহলে তোমার পদচুম্বন করাও হয়ে যেত। এই রকম লালচে বিকেলে দৃশ্যটা কী অপূর্ব সুন্দর হতো বলো !

—তোর সেই রোমান্টিকপনার অসুখ আর গেল না ! কাঁটা কি ছেলের পা মেয়ের পা আলাদা করে চেনে ? যে-কোনো পায়েই বিঁধতে পারে।

—তবু কোনো পুরুষের সঙ্গিনী, যুবতী নারীর পায়ে ফুটলে ব্যাপারটা বেশ খাজুরাহোর শিল্পের মতন হয়।

—তোরা পুরুষরা তাই ভাবিস। আমরা পায়ে কাঁটা ফুটলে কষ্ট পাই !

—হ্যাঁ, আমরা পুরুষরা মেয়েদের অনেক সৌন্দর্যের প্রতীক বলে মনে করি। এমনকি তোমাদের পায়ের পাতা, থুতনির ঘামও আমাদের চোখে সুন্দর লাগে।

তোমরা মেয়েরা পুরুষদের কব্জি, কাঁধ, বুক আর উরুটুরুর সৌন্দর্য নিয়ে কবিতা বা গান বাঁধলেই পারো।

—বয়ে গেছে আমাদের ! আমি আসলে পুরুষ মানুষদের বেশ অপছন্দই করি। কেমন যেন ক্লাম্‌জি ধরনের প্রাণী ওরা।

—এ কী, বন্দনাদি, তা হলে আমি কী ?

—তুই···তোকে তো ঠিক পুরুষ বলে ভাবি না, তুই হচ্ছিস, তুই হচ্ছিস···

—খবরদার,ছোট ভাইয়ের মতন বলবে না ! ঐ ধরনের সম্পর্ক আমি পছন্দ করি না !

—না, বন্ধু, বন্ধুদের তো কোনো জাত নেই, মেয়ে হোক বা পুরুষ হোক, বন্ধু হচ্ছে বন্ধু !

—আমি অবশ্য তা মনে করি না। সে যাই হোক। তুমি সমস্ত পুরুষদের অপছন্দ করো না, তোমার রাগ শুধু বিশেষ একজনের ওপর, যার জন্য তুমি কলকাতা ছেড়ে চলে এসেছো। সে কে ?

—নীলু, আবার ঐ কথা ?

—তুমি ধমক দাও আর যাই-ই করো, শেষ পর্যন্ত আমি ঠিক জেনে যাবো।

বন্দনাদি থেমে গিয়ে আমার দিকে ঘুরে দাঁড়ালো। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে আছে। এটা ওর রাগের লক্ষণ। সেকাল হলে ওর চোখ দিয়ে আগুন বেরিয়ে আমাকে এই মুহূর্তে ভস্ম করে দিত। নাক দিয়ে ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে।

আমার দিকে ডান হাতের তর্জনী তুলে বললো, শোন্ নীলু, কোনো বিশেষ পুরুষের ওপর রাগ করে আমি কলকাতা ছেড়ে চিরকালের জন্য চলে আসিনি। কেউ আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করলে তাকে অবহেলা করা কিংবা তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার মতন মনের জোর আমার আছে। আমি চলে এসেছি অন্য কারণে, তা তুই, শুধু তুই কেন, কেউ কোনোদিন জানতে পারবে না।

—রাগ না হোক অভিমান হতে পারে। রাগের চেয়ে অভিমান আরও বেশি জোরালো হয়।

—আমি তোর ঐ কফি হাউসের বান্ধবীদের মতন ন্যাকা নই যে অভিমান করে বাড়িঘর ছেড়ে চলে আসবো। আমি এসেছি ঠাণ্ডা মাথায় ভেবেচিন্তে।

—তুমি জঙ্গলের মধ্যে শুয়ে থাকা ঐ লোকটিকে জিজ্ঞেস করলে ওঁর অনুতাপ হচ্ছে কি না। কেন জিজ্ঞেস করলে ঐ কথা ? তোমার নিজের বুঝি অনুতাপ হয় মাঝে মাঝে ? নিছক অহমিকার জন্য আর ফিরে যেতে পারছো না।

—না, আমার এক মুহূর্তের জন্যও অনুতাপ হয় না। এ জায়গাটা যে কত সুন্দর, তা তুই কল্পনাও করতে পারবি না।

—বেশি সুন্দরের মধ্যে সর্বক্ষণ থাকায় একটা একঘেয়েমি আসে না ?

—নাঃ, তোকে বোঝানো যাবে না। তুই যে এখনও একটা মায়াবদ্ধ জীব। তখন তোকে একটা চমৎকার ফাঁকা বাড়ি দেখালুম, তাতে তোর কোনো রি-অ্যাকশানই হলো না। শহুরে বাতাসে নিঃশ্বাস না নিলে তোদের প্রাণ ছটফট করে !

—কিন্তু ঐ লোকটিকে যখন তুমি অনুতাপের কথা জিজ্ঞেস করছিলে, তখন তোমার মুখের রেখাগুলো বিশ্বাসঘাতকতা করছিল। তুমি যে কোনো কারণে বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছো, তা বোঝা যাচ্ছিল স্পষ্ট।

—হ্যাঁ, আজ একটু দুর্বল হয়ে পড়েছি, স্বীকার করছি। তোকে দেখার পর থেকেই···

—বাঃ, আমার সৌভাগ্য। এতক্ষণে একটা ভালো কথা শোনালে।

—আরে বোকারাম, তোকে দেখে দুর্বল বোধ করেছি, কিন্তু তোর জন্য নয়। তুই আসার পর হঠাৎ মনে হলো, আমি একটা ভুল করেছি। দারুণ ভুল। রূপসাকে আমার ফেলে আসাটা উচিত হয়নি। একেবারেই উচিত হয়নি। রূপসাকে নিয়ে এলে··· ওর তখন মাত্র তিন বছর বয়েস ছিল, ও কিছুই প্রশ্ন করতো না, ও এইখানেই খুব চমৎকার ভাবে মানুষ হতে পারতো। কিন্তু এখন তো আর উপায় নেই !

—একবার ফিরে গেলেই পারো !

—একবার গেলেই তো ধরা পড়ে যাবো। না, না, না, তা আমি চাই না। তার চেয়ে এই-ই ভালো, সবাই ধরে নিয়েছে আমি নিশ্চয়ই মরে-টরে গেছি !

—না, তা ভাবে নি, অনেকের ধারণা, তুমি বিলেত বা আমেরিকায় পালিয়ে গেছো। দু' একজন বলে, তুমি নাকি বম্বেতে নাম বদলিয়ে সিনেমার হিরোইন হয়েছো। কোনো একজন সাউথ ইণ্ডিয়ান অ্যাকট্রেসের সঙ্গে তোমার মুখের খুব মিল।

—উঃ, এসব কথা শুনলেও গা জ্বলে যায় !

—শোনো, বন্দনাদি, তুমি যদি খুব মনে করো, তা হলে আমি তোমার মেয়ে রূপসাকে চুরি করে এনে এখানে পৌঁছে দিতে পারি।

—থাক, তুই অনেক কীর্তি করেছিস, এরপর আর মেয়ে চুরি করতে হবে না। রূপসা বড় হয়ে গেছে, সে এখন অনেক প্রশ্ন করবে।

আবার খানিকটা হেঁটে আমরা এসে পৌঁছলাম একটা তিন রাস্তার মোড়ে। এখানকার রাস্তাগুলো লাল সুরকি ঢালা। গাড়ি-ঘোড়ার কোনো বালাই নেই।

তিন রাস্তার মোড়ে একটা গোল বাঁধানো জায়গা। অন্যান্য শহরে এই রকম

জায়গায় হয় কোনো বিকট পাথরের মূর্তি কিংবা বেখাপ্পা পোশাক পরা ট্রাফিক পুলিশ দাঁড়িয়ে থাকে। এখানে সে সব কিছু নেই। একজন পা-জামা পাঞ্জাবি পরা প্রৌঢ় বসে আছেন সেখানে, পাশে একটা বেতের ঝুড়ি। ভদ্রলোকের নিশ্চয়ই এক সময় সিগারেট খাওয়ার খুব নেশা ছিল, দুটো আঙুল ঠোঁটে চেপে অদৃশ্য সিগারেট টানছেন।

বন্দনাদির মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো সেই লোকটিকে দেখে। কাছে এগিয়ে বললো, কেমন আছো প্রভাসদা ?

মুখ থেকে হাত নামিয়ে প্রৌঢ়টি বললেন, আমি সব সময় ভালো থাকি। তোমায় তিনদিন দেখিনি কেন, বন্দনা ?

—তিনদিন, না ? আমার মনে হচ্ছে আমি একমাস তোমাকে দেখিনি। তোমার নুন লাগবে, প্রভাসদা ?

—নুন ভাঙতে গিয়েছিলে বুঝি ? দাও খানিকটা।

—তোমার ঝুড়িতে কী, প্রভাসদা ? বাঃ, ভালো আলু হয়েছে তো তোমার ? আমার কিছুটা লাগবে। আমার ক্ষেতে অনেক বেগুন হয়েছে, তুমি নেবে ?

—বেগুন ? আমার ক্ষেতেও বেগুন হয়েছে। আমার কিছুটা গুড় দরকার।

—গুড় তো আমার নেই।

—তাতে কী হয়েছে, তুমি আলু নাও। দেখি, অন্য কারুর কাছে গুড় পেয়ে যাবো।

এখানে টাকা-পয়সার লেনদেন নেই, বিনিময় প্রথায় জিনিসপত্র আদান-প্রদান হয়। যার যেটা বেশি আছে তা নিয়ে সে এরকম এক একটা গোল চক্করে বসে। তবে, চা, তেল, জামাকাপড় কি এরা ঘরে বানায় ? তা মনে হয় না। সেসব নিশ্চয়ই কোনো শহর থেকে আনতে হয়। কে আনে, কী ভাবে অন্যরা নেয় তা আমি এখনো জানি না। এখানে আমি কোনো দোকান দেখিনি।

প্রভাসবাবু আমাকে দেখলেও একটিও কথা বললেন না, বন্দনাদির কাছে জানতেও চাইলেন না আমি কে। এখানকার মানুষের কৌতূহল সত্যিই কম। সেটা কি ভালো ? কৌতূহলই তো জীবনযাপনের প্রধান মশলা।

ঐ লোকটির সঙ্গে কথা বলতে বলতে বন্দনাদি এক সময় আমাকে বললো, তুই এগিয়ে যা, নীলু। প্রভাসদার সঙ্গে আমার কয়েকটা জরুরি কথা আছে।

সেই মুহূর্তে প্রভাস নামের লোকটিকে আমি অপছন্দ করলুম। ঈর্ষাই এর কারণ, সেটাও জানি। জানলেও ঈর্ষার জ্বালা কমে না।

॥ ৪ ॥

দিকশূন্যপুরে কোনো মন্দির-মসজিদ বা গীর্জা নেই, অন্তত আমি দেখিনি, সেরকম আছে বলে শুনিও নি। কারুর বাড়িতে কেউ সে রকম কিছু একটা বানাতেও পারে হয় তো ! তবে এখানে তো ধর্ম-সন্ধানীরা আসে না, তারা কোনো তীর্থস্থানে বা হিমালয়েই যেতে পারে। এখানে যারা আসে তারা স্রেফ পলাতক। নিরুদ্দিষ্ট। প্রায় প্রত্যেকেরই কোনো না কোনো সময়ে খবরের কাগজে ছবি বেরিয়েছে।

এখানে দুটো মোড়ে দুটো পেল্লায় সাইজের ব্ল্যাক বোর্ড আছে। তাতে চকখড়ি দিয়ে যার যা খুশী লিখতে পারে। কেউ কেউ সেখানে ধর্মের বাণী পড়ে, আবার পাশেই থাকে হয়তো কোনো নাস্তিকের কৌতুক। আগের বার আমি কয়েক ঘণ্টা ধরে সব লেখা পড়েছিলুম। আমার সব চেয়ে ভালো লেগেছিল ঐ খড়ি দিয়ে লেখার ব্যাপারটা, অর্থাৎ সব বাণীই ক্ষণস্থায়ী, একজন অন্যেরটা অনায়াসেই মুছে দিতে পারে। বৃষ্টি হলে সবই ধুয়ে যায়।

ঐ রকমই একটা ব্ল্যাক বোর্ডের পাশে মস্ত বড় একটা অশ্বত্থ গাছ, তার পেছনেই বিজনের বাড়ি। মনে আছে। এ পথ সে পথ ঘুরে আমি সেই মোড়ে পৌঁছোলুম। গতকালই বৃষ্টি হয়েছে বলে আজ ব্ল্যাক বোর্ডে প্রায় কিছুই লেখা নেই। নিচের দিকে শুধু একজনের হাতের লেখা কয়েকটি লাইন :

প্রশ্ন

মহাভারতে যুধিষ্ঠির বলেছেন, অঋণী ও অপ্রবাসী হয়ে যে ব্যক্তি নিজের বাড়িতে বিকেলবেলা শাকান্ন খায়, সেই সুখী।

তা হলে প্রশ্ন এই যে, আমরা এখানে প্রবাসী না অপ্রবাসী ? আমাদের কি এখানে কারুর কাছে ঋণ আছে, না নেই ?

বাব্বা, বেশ কঠিন প্রশ্ন ! কাল এসে দেখে যাবো কেউ উত্তর দেয় কি না !

বিজনের বাড়ির কাছে এসে তাকে ডাকার আগেই একটু দূরের আর একটি বাড়ির দাওয়ায় আমি দেখতে পেলুম দুপুরে-দেখা সেই কৃষ্ণবসনা রমণীকে। তিনি আকাশের দিকে চেয়ে কিছু একটা খুঁজছেন।

কথা বলতে সাহস হলো না। আমি তাড়াতাড়ি বিজনের বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে ঢুকে পড়লুম।

বিজনের বাগান নেই, তার আছে পোলট্রি। প্রায় শ'খানেক মুর্গী পোষে সে। সুতরাং সব সময়েই সে ডিমের সাপ্লাই দিতে পারে।

দু' তিনবার ডেকেও কোনো সাড়া পেলুম না। বিজন বাড়িতে নেই। এখানে

চুরি-ডাকাতি প্রায় হয়ই না বলতে গেলে, দু' একবার মাত্র হয়েছে ছিঁচকে ধরনের। কোনো কিছুর অভাব না থাকলেও বোধহয় কোনো কোনো মানুষের মধ্যে চুরির প্রবৃত্তি থেকেই যায়। যাই হোক, এখানকার বেশির ভাগ মানুষই চুরি-টুরি নিয়ে মাথা ঘামায় না বলে সব কিছু এরকম খোলা ফেলে রেখে চলে যেতে পারে।

একটা মোড়া টেনে নিয়ে বসলুম বারান্দায়। একা হওয়া মাত্র খুব সিগারেট টানতে ইচ্ছে করছে। ডান হাতটা পকেটে ঢুকেও থমকে গেল। এখানে কেউ নেই বটে তবু এখানকার নিয়ম ভাঙা ঠিক নয়। দেখা যাক, এই জায়গায় কয়েকদিন থেকে আমিও সিগারেটের নেশাটা ছাড়তে পারি কি না! আজকাল সব দেশেই সিগারেটের বিরুদ্ধে খুব হৈ চৈ। এমনকি সরকার থেকেও হুকুম দেওয়া হচ্ছে যে প্রত্যেক প্যাকেটের গায়ে লিখে দিতে হবে যে সিগারেট টানা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। বেশ তো, সিগারেট যদি এতই খারাপ জিনিস হয়, তাহলে বিড়ি-সিগারেট তৈরি করাটাই একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হয় না কেন? ও, তাতে বড় বড় ব্যবসায়ীদের আঁতে ঘা লাগবে!

এখান থেকেও সেই কৃষ্ণবসনা সুন্দরীকে দেখা যাচ্ছে। সে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে একই জায়গায়। নতুন এসেছে, তাই বোধহয় কোনো কাজ খুঁজে পাচ্ছে না।

কে যেন বিজনদা, বিজনদা বলে ডাকলো।

তাকিয়ে দেখি গেটের সামনে একটি ছেলে দাঁড়িয়ে আছে, তার বয়েস বোধহয় সতেরো-আঠারোর বেশি হবে না। কিন্তু তার মাথায় একটাও চুল নেই। প্যান্ট ও গেঞ্জি পরা। এক হাতে ঝুলছে একটা লাউ।

—বিজনদা নেই?

—না, এখন বাড়িতে নেই।

ছেলেটি ভেতরে এসে বলল, আমার কয়েকটা ডিম দরকার। নেবো?

আমি উদারভাবে বললুম, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, নিতে পারো।

ছেলেটি জানে কোথায় ডিম রাখে বিজন। সে বারান্দায় ঢুকে এসে দ্বিতীয় ঘরটির দরজা খুললো। কয়েকটা ডিম নিয়ে বেরিয়ে এসে লাউটা রাখলো রান্নাঘরের সামনে। আমার দিকে চেয়ে বললো, এটা রেখে গেলাম।

আমি মাথা ঝুঁকিয়ে বললুম, আচ্ছা।

বিজনের বাড়িতে আমার মতন একজন অচেনা মানুষ কেন বসে আছে, সে সম্পর্কে ছেলেটির কোনো আগ্রহ নেই। আর কিছু না বলে সে চলে গেল। বিজনের কি লাউ-এর দরকার আছে? যদি একই দিনে দু' তিনটে লাউ জমা

পড়ে, তাতে কী হয়? কিছু একটা হয় নিশ্চয়ই।

এক ঝাঁক টিয়া পাখি উড়ে গেল আকাশ দিয়ে। এবারে সত্যিই সন্ধে হয়ে আসছে। প্রভাস নামের লোকটার সঙ্গে বন্দনাদির কী এমন কথা থাকতে পারে যা আমাকে শোনানো যায় না?

মুর্গীগুলো খাঁচার মধ্যে ঝটাপটি করছে। কে একজন রাস্তা দিয়ে গুনগুনিয়ে গান গাইতে গাইতে চলে গেল। এই কলোনিতে বিদ্যুৎ নেই, কেরোসিনের বাতিও বিশেষ চোখে পড়ে না, কেউ কেউ ঘরের মধ্যে মোম জ্বালে। রাত্রিগুলি এখানে নিখাদ রাত্রি।

বিজন ফিরলো মাথায় একটা ঝুড়ি নিয়ে। তাতে বালি ভর্তি। আমায় দেখে অবাক হলো না, হাসিমুখে বললো, নীলু, তুই এসেছিস আগেই খবর পেয়ে গেছি। কেমন আছিস?

—ভালো আছি রে বিজন। তুই কার কাছ থেকে খবর পেলি?

—নদীর ধারে বালি আনতে গিয়েছিলাম। বসন্ত রাও-এর সঙ্গে দেখা, সে বললো তোর কথা।

—বালি আনতে গিয়েছিলি কেন?

—মুর্গীর ঘরে দিতে হবে। বালির মধ্যে মুর্গীগুলো ভালো খেলা করে। তাতে ওদের তাড়াতাড়ি গ্রোথ হয়।

কলকাতায় আমি যখন বিজনকে চিনতুম, তখন সে ছিল বই-মুখো। খেলা-ধুলো বা শারীরিক পরিশ্রম করতে দেখিনি কক্ষনো। আজ সে এক ঝুড়ি বালি মাথায় করে এনেছে। নদীটা এখান থেকে কম দূর নয়। বিজনের মুখখানা তামাটে হয়ে গেছে।

—তুই এবারে এখানে থেকে যাবি তো, নীলু?

—থেকে যাবো? না, তা নয়। তোরা সব ছেড়ে কেন এখানে চলে আসিস তা তো আমি জানি না। আমার সেরকম কোনো কারণ ঘটেনি। আমি তোদের দেখতে আসি।

—বন্দনাদির সঙ্গে দেখা হয়েছে? ওখানেই উঠেছিস নিশ্চয়ই?

—হ্যাঁ, বন্দনাদির সঙ্গে দেখা হয়েছে। তবে আমি তোর এখানেও থাকতে পারি।

—আমি জানি, বন্দনাদি তোকে মাথার দিব্যি দিয়ে রেখেছে যে তুই এখানে এলে প্রথমেই ওর বাড়ি যাবি।

—যাঃ, মাথার দিব্যি-টিব্যি কিছু নয়। এমনিই উনি রূপসার খবর জানবার জন্য ব্যস্ত হয়ে থাকেন তো!

—তুই চা খাবি, নীলু ? আমার কাছে চা আছে। তোর জন্য বানাতে পারি।

আমি কাঁধের ঝোলাটা থেকে একটা বড় চায়ের প্যাকেট বার করে বললুম, আমিও তোদের জন্য চা এনেছি। আর টিনের দুধ।

—তুই টিনের দুধ না আনলেও পারতি। এখানে খাঁটি গরুর দুধ পাওয়া যায়। আমার টিনের দুধ ভালো লাগে না। এখানে সব কিছু টাটকা জিনিস খাওয়া অভ্যেস হয়ে গেছে তো!

বিজন রান্নাঘরে ঢুকে কাঠের জ্বালের উনুন ধরিয়ে ফেললো। তারপর এক কেটলি জল বসিয়ে বেরিয়ে আসতেই আমি ঝোলা থেকে গরদের জামাটা বার করে বললুম, এই দ্যাখ, তোর একটা জামা এনেছি। চিনতে পারিস ?

অমনি বিজনের চোখ সরু হয়ে গেল। ভুরু কুঁচকে অপ্রসন্ন গলায় বললো, কেন ওটা এনেছিস ? জানিস না, আমি আগেকার পুরোনো কিছুই চাই না।

আমিও রেগে গিয়ে বললুম, তোদের বড্ড অহংকার, তাই না ? জামাটা কোথা থেকে পেলুম তা জিজ্ঞেস করলি না কেন ? নিজের মা-ও কি আগেকার পুরনো জিনিস ?

বিজন মাথা নিচু করে রইলো কয়েক মুহূর্ত। তারপর আস্তে আস্তে বললো, তুই এখানে আসবার আগে মনোহরপুকুর গিয়েছিলি, তা বুঝতে পারছি। কিন্তু তুই যে এখানে আসছিস, তা কি আর কেউ জানে ? নীলু, তোকে আমরা সবাই বিশ্বাস করি।

—না, সেকথা কেউ জানে না।

—তবে আমার মা কেন ঐ জামাটা তোর হাত দিয়ে পাঠালো ?

—লীলা কাকিমা এই জামাটা তোর জন্য পাঠান নি। এটা আমাকে পরতে দিয়েছেন।

—ও, সেটা বুঝিনি। যাক, তবে ঠিক আছে। ও জামাটা তুই-ই পরবি। ওরকম শৌখিন জামা নিয়ে আমি কী করবো এখানে ?

—ঠিক আছে, তাহলে এটা আমারই হয়ে গেল।

—চায়ের সঙ্গে তুই আর কী খাবি ? বিস্কিট-টিস্কিট নেই, তবে নারকোল নাড়ু আছে। শোভাদি খুব সুন্দর নাড়ু বানান। আমাকে দিয়ে গেছেন অনেকগুলো।

—আমি চায়ের সঙ্গে মিষ্টি কিছু পছন্দ করি না।

—তা হলে তোকে কী দিই ? শুধু চা খাবি ?

আমি কোনো উত্তর না দিয়ে বিজনের দিকে স্থির ভাবে তাকিয়ে রইলুম। কী ভাবে মানুষ এমন করে বদলে যায় ? লীলা কাকিমাকে শুধু ছেড়েই চলে আসেনি বিজন, সে লীলা কাকিমা সম্পর্কে কোনো খবর জানতেও আগ্রহী নয়।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললুম, একটা ছেলে এসেছিল ডিম নিতে, ন্যাড়া মাথা।

—ও বুঝেছি, ওর নাম কুলদীপ। ন্যাড়া নয়, ওর মাথার সব চুল উঠে গেছে। গোঁফ-দাড়িও গজায়নি।

—আচ্ছা বিজন, তোর বাড়ির কাছেই যে আর একজন কালো শাড়ীপরা মহিলাকে দেখলুম, উনি কে ?

—আমরা কেউ ওর নাম জানি না। উনি এখনো কারুর সঙ্গে কথা বলেন না।

—আর তোদের তো কৌতূহল দেখাতে নেই, তাই তোরা কেউ নিজের থেকে কিছু জিজ্ঞেসও করিসনি!

এতক্ষণ বাদে হা-হা করে হেসে উঠলো বিজন। চা ছলকে গেল ওর হাত থেকে। কাপটা হাত থেকে নামিয়ে রেখে ও বলল, তুই আমাদের ওপর রেগে আছিস মনে হচ্ছে! তাহলে তুই বারবার আমাদের দেখতে আসিস কেন ?

—কী জানি কেন আসি! আমার মাথায় পোকা আছে বোধহয়।

—আমার মনে হয়, তুই-ও একদিন আমাদের দলে ভিড়ে যাবি। তোর আর ফিরতে ইচ্ছে হবে না। শোন, নীলু, তুই এক কাজ কর। তুই ঐ কালো শাড়ী পরা ভদ্রমহিলার কাছে চলে যা! তুই তো বাইরের লোক, তুই যা ইচ্ছে প্রশ্ন করতে পারিস!

—ওকে দেখলে কী রকম যেন ভয় ভয় করে।

—একজন মহিলাকে দেখে ভয় করার কী আছে ? হয় উত্তর দেবেন, নয় দেবেন না। গিয়েই দ্যাখ না!

—অর্থাৎ তুই আমাকে এখন চলে যেতে বলছিস ? কেউ আসবে বুঝি ?

—তুই সব কথার উল্টো মানে বুঝছিস। থাকতে চাস থাক না যতক্ষণ ইচ্ছে। তুই ঐ মহিলা সম্পর্কে জানতে চাইছিলি।

আমি উঠে পড়লুম। বিজনের সঙ্গে আমার মন মিলছে না। এর চেয়ে একলা একলা হেঁটে বেড়ানোও ভালো।

॥ ৫ ॥

বাইরে এসে মনে হলো, ঐ কৃষ্ণবসনাকে একবার বাজিয়ে দেখাই যাক না। কামড়ে তো দেবে না!

মহিলাটি এখন বারান্দায় নেই। আমি কাছাকাছি গিয়ে দু'একবার গলা খাঁকারি দিলুম। যার নাম জানি না তাকে কী বলে ডাকবো?

এই বাড়িটাতে আগে কে ছিল? ঠিক মনে করতে পারি না। আমি অবশ্য এখানকার সবাইকে চিনি না। কেউ কেউ আজীবন থাকবে বলে আসে কিন্তু দু'এক বছর বাদে ফিরে যায়। এ বাড়ির আগের মালিক শৌখিন ছিলেন। তিনি বেগুন-আলু-পেঁয়াজ চাষ করার বদলে অনেকগুলি গোলাপগাছ লাগিয়েছিলেন। সেই গাছগুলি এখন বিবর্ণ।

আমি ইচ্ছে করে মোরাম ঢালা পথে পা ঘষার শব্দ করলুম। তাতেই বেরিয়ে এলো মহিলাটি। ঠাণ্ডা চোখে চেয়ে রইল সোজাসুজি।

আমি দু' হাত তুলে বললুম, নমস্কার।

সে প্রতিনমস্কার করল না, কোনো উত্তরও দিল না। তাকিয়ে রইলো একই ভাবে। ওর মুখের মধ্যে এমন একটা ভাব আছে যা চেনা চেনা, অথচ এই মহিলাকে আমি আগে কখনো দেখিনি, তা নিশ্চিত।

আবার বললুম, আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছি। অবশ্য এখন যদি আপনার অসুবিধে থাকে, পরে আসবো।

রমণীটি এবারে বললো, এসো, ভেতরে এসো।

প্রথমেই তুমি সম্বোধনে একটু চমক লাগে। ওর বয়েস তেত্রিশ-চৌত্রিশের বেশি নয়। অন্ধকারের সঙ্গে ওর কালো শাড়ীখানা মিশে গেছে, দেখা যাচ্ছে শুধু মুখখানা আর হাতদুটি।

আমি বললুম, ঘরের মধ্যে তো বড্ড অন্ধকার, বাইরেই বসা যাক না।

—না, তুমি ভেতরে এসো।

ঘরে ঢুকে সে একটি মোটা লাল রঙের মোমবাতি জ্বাললো। সে ঘরে রয়েছে একটা খাট, একটি চেয়ার আর দেয়ালে একটি আয়না।

সে নিজে চেয়ারটায় বসে আমাকে খাটে বসতে ইঙ্গিত করলো। আমিও পা ঝুলিয়ে বসে পড়লুম বিনা দ্বিধায়. দিকশূন্যপুরে কোনো কিছুই অস্বাভাবিক নয়।

—আমার নাম রোহিলা। তুমি কে?

—আমার নাম নীললোহিত। আমি এখানে থাকি না, বাইরে থেকে বেড়াতে এসেছি, আজই।

—আমি এসেছি বারোদিন আগে, কিংবা তেরদিন, কিংবা সতেরো দিন, ঠিক জানি না, গুণতে ভুলে গেছি!

দু' হাতে মুখ চাপা দিয়ে হঠাৎ সে কেঁদে উঠলো। এক পশলা বৃষ্টির মতন। যেরকম বৃষ্টিতে মানুষ ছুটে পালায় না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভেজে, আমিও সেরকম

ভাবে কোনো কথা না বলে দেখতে লাগলুম ওর কান্না।

একটু পরে হাত সরিয়ে সে জিজ্ঞেস করলো, আমার চেহারায় বা মুখে কি এমন কিছু ছাপ আছে যাতে লোকে আমায় ঘৃণা করবে? এখানে সবাই আমাকে দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

—না, না, তা কেন হবে, আপনি ভুল ভাবছেন।

—আমাকে আপনি আজ্ঞে করতে হবে না। আমার বয়েস মাত্র তিন বছর। কিন্তু আমার সঙ্গে কেউ একটাও কথা বলে না কেন?

এবারে শরীরে একটা শিহরন হলো। বলে কী, ওর বয়েস মাত্র তিন বছর? মেয়েটা পাগল-টাগল না তো?

—আপনি…মানে…তুমি ভাবছো কেউ তোমার সঙ্গে কথা বলে না। আর এখানকার লোক ভাবছে, তুমি তাদের সঙ্গে কথা বলতে চাইছো না।

—আমি নতুন এসেছি, আগে তো ওরাই এসে আমার সঙ্গে ভাব করবে, আমাকে সাহায্য করবে।

—যারা নতুন আসে, সব কিছু ছেড়েছুড়ে, তারা প্রথম প্রথম খুব স্পর্শকাতর হয়ে থাকে। অন্য কেউ সে রকম কারুর সম্পর্কে কৌতূহল দেখালে সে রেগে যায় বা পুরোনো দুঃখটা হু-হু করে এসে পড়ে।

—দুঃখ?

—কোনো না কোনো দুঃখের পটভূমিকা নিয়েই তো মানুষ এখানে আসে।

—ও হ্যাঁ। তা বোধহয় ঠিক। তাহলে তুমি, তোমার কী যে নাম বললে?

—নীল, নীল—

—নীললোহিত।

—এরকম নাম আগে শুনিনি। আমার নাম রোহিলা, এই নামটা কেমন?

—নতুনত্ব আছে। আমিও এই নাম আগে শুনিনি।

—আগে আমার অন্য নাম ছিল। অনেক দিন আগে, গত জন্মে।

—তুমি সব সময় এরকম কালো শাড়ী পরে থাকো কেন?

—কেন, তাতে কী হয়েছে?

—সত্যি কথা বলবো? ঐ কালো শাড়ীর জন্য তোমার মুখটা পাথরের মতন দেখায়। মনে হয়, তুমি মানুষ নও, একটা মূর্তি।

রোহিলা মোমটা তুলে নিয়ে নিজের মুখের কাছে আনলো। খুব কাছে। তারপর আলোর শিখার দিকে তাকিয়ে জোর দিয়ে বললো, আমার মুখে একটা ছ্যাঁকা দেবো? তাহলে আমাকে মানুষ মানুষ মনে হবে না?

এই মেয়েটা পাগল নিশ্চিত। তার ফর্সা মুখে তার চোখদুটো হীরে-কুচির

মতন জ্বলছে।

আমি হাত বাড়িয়ে মোমবাতিটা সরিয়ে নিয়ে বললুম, ছিঃ, সুন্দরকে কখনো নষ্ট করতে নেই।

রোহিলা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, কালো কাপড়ে শরীরটা ঢেকে রাখি, যাতে লোকেরা আমার শরীরের বদলে শুধু মুখের দিকে তাকায়। একবার একজন আমার একটা মূর্তি বানিয়েছিল, তাতে কোনো পোশাক ছিল না!

আমার শ্রবণেন্দ্রিয় তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো। একটা গল্পের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। এখানে কেউ ফেলে আসা জীবনের কথা বলে না।

—বম্বেতে আমি অনেকদিন মডেলের কাজ করেছি। তখন শুধু শরীর দেখাতে হয়েছে। শুধু শরীর। মডেলের হৃদয় থাকতে নেই। হৃদয় নিয়ে কোনো বিজ্ঞাপন হয় না। সেই সময়কার কথা ভাবলেই আমার কান্না পায়।

—তোমার কোনো বন্ধু ছিল না?

—ছিল অনেক শরীরের বন্ধু। মনের সঙ্গী ছিল না কেউ। আমার যে মন বলে কিছু আছে তা বুঝতেই শিখিনি। আমার ছিল কতগুলো ইচ্ছে, এটা চাই, সেটা চাই, ওটা ভালো, ওটা পছন্দ নয়, এই রকম। এর নাম মন?

—তারপর?

—তুমি কেন বললে আমায় মূর্তির মতন দেখায়? যে-জীবন আমি ফেলে এসেছি···

—আমার ঠিক যা মনে হয়েছে, তাই বলেছি। এখন তোমার চোখে জল, এখন আর সেরকম দেখাচ্ছে না।

—মডেলিং করতে করতে আমি ফিল্‌মে চলে এলাম। যারা আমার ছবি তুলতো, তারা বললো, তুমি এবারে মুভি ক্যামেরার সামনে দাঁড়াও!

আমি সোল্লাসে বললুম, আহ্, এইবার বুঝতে পেরেছি! ঠিক ধরেছিলুম!

রোহিলা অবাক চোখ তুলে বললো, কী?

—তোমাকে আগে আমি কখনো দেখিনি, তবু তোমার রূপটা কেন চেনা চেনা লাগছিল! সিনেমায় নায়িকাদের মুখ এরকম হয়। যে-মুখে অনেক জোরালো আলো পড়ে, সেই মুখের ত্বক কেমন যেন বদলে যায়।

—না, আমি নায়িকা হইনি কোনোদিন, প্রথমে ছোটখাটো পার্ট, তারপর মাঝারি। বেশির ভাগ সময়েই ভিলেনের সঙ্গিনী! মদ খাওয়ার দৃশ্য, ষড়যন্ত্র, জাঙ্গিয়া আর কাঁচুলি পরে নাচ, ঘোড়ার পিঠে, কখনো হাতে মশাল··· আমি কতবার মরেছি জানো? উনিশবার!

—বি-গ্রেড মুভি?

—একটা বইতে দিলীপকুমার ছিল। শোনো, আমি তখন মানুষ ছিলাম না, মেয়ে ছিলাম না, ছিলাম একটা পুতুল, কিংবা পোষা জন্তুর মতন। আমাকে ওরা বলতো, তুমি চেয়ারের ওপর এই ভাবে এক পা তুলে দাঁড়াও, তাতে তোমায় সেক্সি দেখাবে। এই ভাবে তুমি ভিলেনের গলা জড়িয়ে ধরো, এই ভাবে তুমি শোও, যাতে তোমার ব্রেস্ট আর হিপ্‌স এক সঙ্গে দেখা যায়। এই ভাবে তুমি ঘাগড়া উড়িয়ে ঊরু দেখিয়ে, নদীতে ঝাঁপ দাও! হ্যাঁ, বিশ্বাস করো, ওরা এই রকম বলে।

—আন্দাজ করা শক্ত কিছু নয়।

—তাহলে বলো, আমি ছিলাম ঐ পুরুষদের হাতের একটা খেলনা কিনা? আর কিছু না! কিংবা, তুমি বাঁদর নাচ দেখেছো?

—তারপর তুমি বুঝি ফিল্‌ম ছেড়ে দিলে?

—প্রায় সব ফিলমেই শেষ দিকে আমাকে মরে যেতে হয়। কত রকম ভাবে আমি মরেছি। গুলি খেয়ে, আগুনে জ্যান্ত পুড়ে গিয়ে, সাপের কামড়ে, নিজের হাতে বিষ খেয়ে—মরতে মরতে আমি ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলাম। সবাই বলতো, আমার মরার সীনগুলো ভালো হয়। মফঃস্বলের দর্শকরা খুশী হয়ে হাততালি দেয়। সেই জন্য স্ক্রিপ্ট রাইটাররা আমার ডেথ সীন দেবেই দেবে। তিন বছর আগে রোহিলাখণ্ডে একটা শুটিং ছিল, পাঁচ দিনের কাজ, শেষ দিনে আমাকে ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়ে মরতে হবে। আমি মরলুম। সেকেন্ড টেক-এই ও কে হলো, আমি পোশাকের ধুলো ঝেড়ে বেরিয়ে গেলুম সেট থেকে। তখনই ঠিক করলুম, এবারে আমি বাঁচবো, নিজের মতন করে বাঁচবো। সেট থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে এলাম রেল স্টেশানে। টিকিট না কেটেই প্রথম যে ট্রেন পেলাম চড়ে বসলাম তাতে। সেই দিন থেকেই রোহিলার জন্ম।

—তুমি এই জায়গাটার খোঁজ পেলে কী করে?

—প্রথম প্রথম ভুল করেছি অনেক। নিজের মতন করে কী ভাবে বাঁচতে হয়, সেটাই তো শিখিনি। হাতে টাকা ছিল, এ হোটেলে, সে হোটেলে থাকতাম। ড্রিংকের নেশা হয়ে গিয়েছিল, কাটাতে পারছিলাম না। তারপর ছবি আঁকতে শুরু করলাম। আঁকতে জানি না, বুঝলে, এমনিই হিজিবিজি ছবি, এখানে সেখানে ধ্যাবড়া রং দিই, তবু এঁকে যেতে লাগলাম, একটার পর একটা, মনে আনন্দ পাচ্ছিলাম তাতে। ওমা, সেই ছবিই অনেকে ভালো বলতে লাগলো। হোটেলের বাগানে বসে ছবি আঁকছিলাম একদিন, কৃষ্ণ আইয়ার বলে একটা লোক, আমার পেছনে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে তা দেখছিল। সে হঠাৎ বললো,

তোমার ছবি খুব দারুণ ! একেবারে নতুন ধরনের। তুমি এক্সিবিশান করো নি ? কী অন্যায় কথা !

—তুমি তোমার আঁকা ছবি এনেছো এখানে ?

—তুমি ছবির কিছু বোঝো ?

—না, সেরকম বুঝি না। তবে ভালো ছবি দেখলে ভালো লাগে। খারাপ ছবি দেখলে আপনি আপনিই চোখটা অন্যমনস্ক হয়ে যায়।

—না, আমার কোনো ছবি আনিনি। শোনো না, তারপর কী হলো ! ঐ কৃষ্ণ আইয়ার আরও কয়েকটা লোক জুটিয়ে আনলো, তারা সবাই মিলে এমন প্রশংসা করতে লাগলো যে আমি একেবারে গলে গেলাম। বেশি প্রশংসা শুনলে অনেকেরই মাথা ঘুরে যায় কি না বলো ? বুঝলে, নীললোহিত, তার মানে আমি আবার পুরুষদের হাতের পুতুল হয়ে গেলাম। ঐ কৃষ্ণ আইয়ারই উদ্যোগ করে পুনেতে আমার ছবির একটা এক্সিবিশন করলো। দু'তিনটে কাগজে খুব প্রশংসা বেরুলো আমার ছবির। একজন ক্রিটিক লিখলো, আমার মতন বোল্ড স্ট্রোক সে আগে কখনো দেখেনি। আমার কেমন যেন সন্দেহ হতে লাগলো। এরকম কী হয় ? ছবি আঁকা কোনোদিন শিখিনি। ভালো ভালো পেইন্টারদের আসল ছবিও দেখিনি বেশি··· কিন্তু ওরা এরকম বাড়াবাড়ি করছে ! একদিন সন্ধেবেলা ঐ কৃষ্ণ আইয়ার আর সেই ক্রিটিক মদের বোতল নিয়ে এলো আমার হোটেলের ঘরে। আমি ওদের মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিইনি। ওদের যত্ন করে বসালাম। গেলাস দিলাম, শুনতে লাগলাম ওদের কথা। তখন বুঝলাম, হ্যাঁ, যা সন্দেহ করেছিলাম, ঠিক তাই। ওরা এত আদিখ্যেতা করছে, তার কারণ, আমি একজন মেয়ে। একা একা হোটেলে থাকি, আমার শরীরটা দেখতে খারাপ নয়···আমার শরীর বুঝলে ? পরদিন আমি বিকেলবেলা আমার এক্সিবিশানে গিয়ে দেয়াল থেকে সবকটা ছবি খুলে নিয়ে এক জায়গায় জড়ো করে দর্শকদের সামনেই তাতে আগুন ধরিয়ে দিলাম।

—সত্যি সত্যি ?

—আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না ? গত তিন বছর আমি একটাও মিথ্যে কথা বলিনি। আগে অনেক বলেছি অবশ্য। কিন্তু সে তো গত জন্মের কথা।

—তারপর এখানে কী করে এলে ?

—ছবিগুলোতে আগুন ধরাবার পর আমি হাপুস নয়নে কাঁদছিলাম, তখন আমারই বয়েসী একটি মেয়ে জোর করে আমাকে তার বাড়িতে ধরে নিয়ে গেল। সেই মেয়েটির নাম ভারতী পটবর্ধন। কী চমৎকার মেয়ে তোমাকে কী বলবো। সে আমার বন্ধু হয়ে গেল। সে আমার সব কথা শুনে বললো, তুমি এরকম

হোটেলে হোটেলে ঘুরে কী করে নিজের মতন করে বাঁচবে ? হয় তুমি নিরুদ্দেশে চলে যাও কিংবা বিয়ে করে ঘর-সংসার পাতো। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলুম, নিরুদ্দেশে যারা যায় তারাও তো কোথাও না কোথাও থাকে। তারা কোথায় যায় ? ভারতী তখন বললো, সবাই কোথায় যায় তা আমি জানি না। তবে কেউ কেউ যায় দিকশূন্যপুরে।

—ঐ ভারতী কী করে জানলো ?

—ভারতী নিজেও একবার নিরুদ্দেশ হয়েছিল। এখানে এসে ছিল টানা পাঁচ বছর। কিন্তু পিছু-টান কাটাতে পারেনি। ফিরে গেছে। আমি ভারতীর কথা শুনে ভাবলাম, কোনো একটা জায়গায় পাঁচ বছর কাটিয়ে যদি ভারতীর মতন এরকম সুন্দর মন হয়, তাহলে সেখানে আমি যাবোই যাবো !

—বোধহয় তুমি ঠিক জায়গাতেই এসেছো। এখানে তোমার কোনো অসুবিধে হয়েছে এ পর্যন্ত ?

—না, সেরকম কোনো অসুবিধে হয় নি। এখানে কেউ আমার সঙ্গে কথা বলছে না বটে, কিন্তু কেউ ডিসটার্বও করে না। রাত্তিরে এসে কেউ দরজা ঠেলে নি। এরকম অভিজ্ঞতা আমার নতুন, একেবারে নতুন। এরকম জায়গা যে থাকতে পারে···তবে একটা ব্যাপারে খটকা লাগছে। বলবো ?

—কী ?

—এখানে দেখছি, প্রায় সবাই সারাদিন খাবার-দাবারের চিন্তায় ব্যস্ত থাকে। কেউ চাষ করছে, কেউ মুর্গী কেউ হাঁস, গরু···এই সব নিয়েই কেটে যায় দিন···কিন্তু এটা, এটার কী খুব দরকার ?

এটা অনেকটা প্রিমিটিভ ব্যাপার নয় ? খাদ্যের চিন্তাতেই যদি দিন কেটে যায়···

—এখানে তো অনেক লেখাপড়া জানা লোকও আছে। কিংবা এমন অনেকে, যাদের আগেকার জীবন খুব শৌখিন ছিল, তারা যখন স্বেচ্ছায় এটা করছে··· হয়তো এর মধ্যে একটা অন্যরকম আনন্দ আছে। কয়েকদিন থেকে দ্যাখো।

—তুমি গম্ভীর ভাবে এসব কথা বলছো কেন ? তুমি তো এখানে থাকো না বললে ?

—কী জানি, কোনোদিন হয়তো পাকাপাকি চলে আসবো ! তোমাকে আর একটা কথা বলতে চাই। হয়তো তোমার সত্যিই ছবি আঁকার প্রতিভা আছে। না শিখলেও ভালো ছবি আঁকা যায়। তুমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম শুনেছো ?

—কে না শুনেছে ? তুমি আমাকে এত মূর্খ ভাবছো ?

—না, তুমি বম্বেতে থাকতে তো। সেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও ছবি আঁকা কখনো শেখেননি, কিন্তু শেষ জীবনে তিনি যে-সব এঁকেছেন তা অনেক বড় বড় শিল্পীর চেয়েও···

—তিনি যে ছবিও এঁকেছেন সেটা জানতাম না।

—এখানে বসন্ত রাও নামে একজন শিল্পী থাকে। তার কাছে তুমি একদিন কিছু ছবি এঁকে দেখাও না। সে তোমায় মিথ্যেমিথ্যি প্রশংসা করবে না।

—আজ দুপুরে যে লোকটি ছবি আঁকছিল, তুমি যার সঙ্গে কথা বলছিলে ? আমার খুব লোভ হচ্ছিল কাছে যেতে, কিন্তু সাহস হলো না, তোমরা কেউ আমার সঙ্গে কথা বললে না।

—আমরা ভাবছিলুম, তুমিই কথা বলতে চাও না। এই রকম ভুল বোঝাবুঝিতে যে কত সময় নষ্ট হয় ! যাক গে, আমি তোমার সঙ্গে বসন্ত রাও-এর আলাপ করিয়ে দেবো !

—দেবে ? এখন দেবে ? চলো না, যাই।

—এখন ? এখন এই অন্ধকারে তার বাড়ি চিনতে পারবো না বোধহয়। কাল যাবো নদীর ধারে। এখন, তুমি যদি চাও, তোমার সঙ্গে একজন ইন্টারেস্টিং মহিলার আলাপ করিয়ে দিতে পারি। তার নাম বন্দনা। তার বাড়িতেই আমি উঠেছি।

—হ্যাঁ, তাই চলো। প্রথমে একজন মেয়ের সঙ্গে আলাপ হলেই আমার বেশি সুবিধে হবে। চলো—

—তোমার ঐ কালো শাড়ীটা বদলে নাও, প্লীজ ! ওটা আমার পছন্দ হচ্ছে না। তোমার অন্য কোনো পোশাক নেই ?

—জিন্‌স আছে। এখানে ওসব পরলে কেউ কিছু মনে করবে ?

—এখানে কেউ কিছু মনে করে না !

—তাহলে এক মিনিট সময় দাও, আমি চেঞ্জ করে নিই।

—করে নাও, আমি বাইরে দাঁড়াচ্ছি।

—তুমি বসে থাকলেও আমার কোনো অসুবিধে নেই। জানো তো, আমি আগে—

—তাতে আমার অসুবিধে হতে পারে। তোমার আগের জীবনের কথা অন্যদের আর বলতে যেও না। এখানে কেউ শুনতে চায় না। তুমি তৈরি হয়ে এসো, আমি সামনের রাস্তায় আছি।

বেরিয়ে, মনের ভুলে সিগারেট ধরাতে গিয়েও প্যাকেটটা আবার পকেটে রেখে, হাঁটতে হাঁটতে চলে এলাম বিজনের বাড়ির সামনে।

অন্ধকারের মধ্যেই বিজন ওর বাড়ির চত্বরে একটা বাঁশের খুঁটি পুঁতছে। আমি কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই বিজন বললো, তুই তো অনেকক্ষণ কাটালি মহিলার সঙ্গে ! কী বললো ?

আমি বললুম, উঁহুঃ, এখানকার মানুষদের তো কৌতূহল দেখাতে নেই। সেইজন্য আমি কিছুই বলবো না। তবে যে-বিষয়ে তোর কোনো কৌতূহল নেই সেই বিষয়ে আমি তোকে কিছু বলতে চাই। এখানে আসবার আগে লীলা কাকিমার সঙ্গে আমার অনেকক্ষণ কথা হয়েছে। উনি তোর উধাও হয়ে যাবার ব্যাপারটা বেশ সুন্দর ভাবে মেনে নিয়েছেন। উনি বললেন, আজকাল কত ছেলে তো বিদেশে থাকে, পাঁচ বছর দশ বছরেও দেখা হয় না। তা নিয়ে কী দুঃখ করলে চলে ?

বিজন উঠে দাঁড়িয়ে হাত থেকে মাটি ঝাড়লো। চুপ করে রইলো বেশ কয়েক মুহূর্ত।

তারপর আমার বাহু ছুঁয়ে গাঢ় গলায় বললো, দ্যাখ নীলু, এখানে এসে প্রায় প্রত্যেকদিনই আমার মা-র কথা মনে পড়ে। কলকাতার আর বিশেষ কিছু আমি মনে রাখতে চাই না, মন থেকে ঝেড়ে ফেলেছি। কিন্তু মা-কে প্রায় রোজই স্বপ্ন দেখি। নীলু, এখানে এসে আমি বুঝতে পারছি, ছেলেদের একটা বয়েস হলে মা'কে আর তেমন প্রয়োজন হয় না, কাছাকাছি থাকলে মায়ের অস্তিত্বটাই অনেক সময় খেয়াল থাকে না। কিন্তু দূরে গেলেই মাতৃ-টান টের পাওয়া যায় !

॥ ৬ ॥

জিন্‌স আর জয়পুরী কাজ করা জামা পরায় রোহিলার চেহারাটা একেবারে বদলে গেছে। তার মুখখানি এখন রক্তমাংসের একটি ফুল। পোশাক অনুযায়ী মানুষের গমনভঙ্গিও বদলে যায়। গাম্ভীর্য বা প্রতিরোধের বাতাবরণ একেবারেই খসে গেছে।

আমার পাশে পাশে হাঁটতে হাঁটতে রোহিলা কৌতুক ঝলমল গলায় বললো, তুমি যখন প্রথম আমার বারান্দার সামনে এসে দাঁড়ালে, আমি ঘরের মধ্য থেকে তোমাকে দেখতে পেয়েছিলাম। তখনই আমি একবার ভেবেছিলাম, আজই আমার এখানে থাকার শেষ। আমায় চলে যেতে হবে।

—কেন, ওরকম মনে হলো কেন ? আমায় কি ভগ্নদূতের মতন দেখাচ্ছিল ? তুমি ভেবেছিলে, আমি তোমায় কোনো খারাপ খবর দিতে এসেছি ?

—না, তা নয়। আমি অনেক খারাপ পেরিয়ে এসেছি, আর বেশি কী হবে? আমি এখন শুধু ভালো লাগা-না-লাগার ওপর নির্ভর করে চলি। তোমাকে আমি ঘরের মধ্যে ডেকে খাটের ওপর বসতে বললাম কেন বলো তো? আমি দেখতে চেয়েছিলাম, তুমি প্রথম সুযোগেই আমার গায়ে হাত দেবার চেষ্টা করো কি না!

—যাঃ, তা আবার হয় নাকি? ভালো করে আলাপ···পরিচয়···কিংবা প্রেম-ট্রেম হবার আগে কেউ কোনো মেয়ের গায়ে হাত দেয়?

—তুমি পৃথিবীটা কিছুই চেনো না মনে হচ্ছে। তোমার চেয়ে আমি অনেক বেশি দেখেছি। আমি যখন প্রথম কাঁদলুম, তখন ভেবেছিলুম তুমি নির্ঘাৎ আমার মাথায় হাত দেবে, উঠে এসে আমাকে তোমার বুকে চেপে ধরবার চেষ্টা করবে। তা বলে আমি মিথ্যেমিথ্যি কাঁদিনি। সত্যি হঠাৎ কান্না এসে গিয়েছিল। আমি অভিনয় করা একেবারে ছেড়ে দিয়েছি।

—আমি সেরকম কিছু করলে কী হতো?

—ভাবতুম যে এই দিকশূন্যপুর অন্যান্য যে-কোনো জায়গার মতনই একটা পচা জায়গা! এখানেও ছ্যাঁচড়ারা রয়েছে। চলে যেতুম কাল সকালেই।

—যাক, আমি তাহলে দিকশূন্যপুরের মান বাঁচিয়েছি।

—তুমি কী করো, নীললোহিত? তুমি আমার সব কথা শুনলে, তোমার নিজের কথা কিছু বললে না?

—আমি কী করবো, সেইটাই এখনো ভেবে ঠিক করতে পারিনি। এটাই আপাতত আমার নিজের কথা!

—অর্থাৎ তুমি বলবে না কিছু! ঐ যে বন্দনা বলে মেয়েটির কথা বললে, ও তোমার কে হয়?

—সর্বনাশ, তোমার কৌতূহল যে খুব বেশি দেখছি! রোহিলা, এখানে কেউ ব্যক্তিগত প্রশ্ন করেই না বলতে গেলে। অবশ্য আমার বেলা সেটা খাটে না। বন্দনা আমার সেরকম কেউ হয় না। এমনিই আমার চেনা।

টিলার নিচে কুয়োর পাশের বাড়িটিতে মোমের আলো জ্বলছে না। অঙ্কের পণ্ডিতটিকেও দেখা যাচ্ছে না। সে বাড়ির পাশ দিয়ে টিলার ওপরের দিকে উঠতে যেতেই ডুম্ ডুম্ শব্দ শুনতে পেলুম। অনেকটা মাদলের আওয়াজের মতন। এমনিতেই এখানে গাড়ি-ঘোড়া চলে না বলে শব্দ কম, সন্ধের পর সব দিক একেবারে অদ্ভুত নিস্তব্ধ। মাদলের আওয়াজটা খুব কাছে মনে হয়।

রোহিলা যেন ভয় পেয়ে আমার হাত চেপে ধরে বললো, ও কিসের আওয়াজ?

আমি বললুম, হয়তো কাছাকাছি কোনো আদিবাসীদের গ্রাম আছে। আর কোনো সন্ধেবেলা এরকম শব্দ শোনোনি?

—না তো!

ডুম্ ডুম্ শব্দটা বেজেই চলেছে।

টিলার ওপর থেকে কে যেন নেমে আসছে, পায়ের আওয়াজে বোঝা গেল। আমরা এক পাশে সরে দাঁড়ালুম। কাছে আসতে দেখতে পেলুম বন্দনাদিকে। হাতে একটা টর্চ, আমাদের দেখার পর জ্বাললো।

আমি বললুম, বন্দনাদি, এর নাম রোহিলা। তোমার সঙ্গে আলাপ করাবার জন্য নিয়ে এসেছিলাম।

বন্দনাদি প্রথমে চিনতে পারলো না। তারপর বললো, ও, আপনিই তো মাসখানেক আগে এসেছেন?

রোহিলা বললো, আমি কালো শাড়ী পরে থাকতাম। এই ছেলেটি বললো, ঐ পোশাকে আমাকে মড়া মড়া দেখায়।

আমি বললুম, তা বলিনি। বলেছি, মূর্তির মতন।

বন্দনাদি বললো, নীলু, তুই এত দেরি করলি, আমি তোর জন্য অপেক্ষা করছিলুম। আজ আমাদের মিটিং আছে, ঐ যে শুনছিস না ডাকছে মাদল বাজিয়ে!

—ওটা তোমাদের মিটিং-এর ডাক? আমি যেতে পারি সেখানে?

—খোলা রাস্তার ওপর মিটিং হবে, যে-কেউ যেতে পারে। চল, তাড়াতাড়ি চল।

আমরা আবার উল্টোদিকে ফিরলুম।

রোহিলা আমাকে বললো, এই, তুমি ওকে দিদি বলছো কেন? আগে যে বললে কেউ হয় না?

আমি বললুম, সত্যি, দিদি বলার কোনো মানে হয় না। নিছক একটা অভ্যেস। বন্দনাদি, আজ থেকে আমি তোমায় শুধু নাম ধরে ডাকবো?

বন্দনাদি বললো, মোটেই না! ওসব চলবে না। আমায় নাম ধরে ডাকলে চাঁটি খাবি।

রোহিলা বললো, তা হলে আমাকেও দিদি বলা উচিত। আমি তোমার থেকে নিশ্চয়ই বয়েসে বড়!

আমি বললুম, আরে, আমি কি বিশ্বশুদ্ধু মেয়ের সঙ্গে দিদি পাতাবো নাকি? ওসব আমি বিশ্বাসই করি না।

টিলার নিচের রাস্তায় একজন, দু'জন মানুষ দেখা যাচ্ছে। সবাই চলেছে মিটিং-এ। একটু একটু জ্যোৎস্না আছে আকাশে। বাতাসে কিসের যেন চাপা

গন্ধ। এই রকম রাতে বসে থাকার চেয়ে বেড়াতেই ভালো লাগে।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, বন্দনাদি, মিটিং কে ডাকে ? তোমাদের এখানে কী প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারির কোনো ব্যাপার আছে !

—না, না, সেসব কিছু নেই। যে-কেউ ডাকতে পারে। তবে তার আগে আর অন্তত যে-কোনো দু'জনের সম্মতি নিতে হয়। অর্থাৎ যদি মোট তিনজন মনে করে কোনো একটা ব্যাপার সবাইকে জানানো দরকার, তাহলেই মিটিং ডাকা যায় !

—সন্ধেবেলা মিটিং হয় ?

—গরমের দিনে সন্ধেবেলাই তো ভালো, বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা থাকে। শীতকালে মিটিং হয় দুপুরে। জানিস তো, এমনও হতে পারে, আজকের মিটিংটা তোকে নিয়ে।

—অ্যাঁ ? আমাকে নিয়ে। তার মানে ?

—তুই বাইরের লোক হয়েও এখানে মাঝে মাঝে আসিস, সেটা অনেকের পছন্দ না হতেও পারে।

—কিন্তু কেউ যদি এরকম চলে আসে, তাকে কি তোমরা বাধা দিতে পারো ? এই জায়গাটা প্রাইভেট প্রপার্টি নয় নিশ্চয়ই।

—তা নয় অবশ্যই। জানি না ওরা কী বলবে !

—ধরো, বাইরে থেকে যদি একদল ছাত্র এখানে ট্রাকে চেপে পিকনিক করতে আসে, বিকট সুরে মাইক বাজায়, গাছ-পালা নষ্ট করে, তাহলে তোমরা কী করবে ?

—ভাগ্যিস সেরকম কিছু হয় নি এখনো। তুই এসব অলক্ষুণে কথা বলছিস কেন রে ?

রোহিলা বললো, আমি যখন এখানে পৌঁছোলুম, তখন দুপুর, রাস্তার একজন লোককে জিগ্যেস করলাম, আমি এখানে থাকতে পাবো ? সে একটা খালি বাড়ি দেখিয়ে দিয়ে চলে গেল। আশ্চর্য, একটা কথাও জিজ্ঞেস করলো না।

বন্দনাদি বললো, এতে আশ্চর্য হবার কী আছে ? একটা খালি বাড়ি পড়ে থাকলে নতুন কেউ এসে সেখানে থাকবে, এটাই তো স্বাভাবিক।

—কিন্তু ভাড়াটাড়া লাগে না ? পৃথিবীতে এমনি এমনি কোথাও বাড়ি পাওয়া যায় নাকি ?

—এখানেও ভাড়া লাগে। শুধু প্রথম বছরটায় কোনো ভাড়া দিতে হয় না, কারণ প্রথম আসার সময় অনেকের কাছেই পয়সা থাকে না। তখন সব কিছু ফ্রি। এক বছর পর থেকে যে-কোনো ভাবে উপার্জন করে সব শোধ দিতে হয়।

—কাকে শোধ দিতে হয় ? কে বাড়ি ভাড়া নেয় ?

—অতসব তোকে বলবো কেন রে ? তুই তো বাইরের লোক !

মাদলের আওয়াজটা থেমে গেছে। এবারে বোধহয় সভা শুরু হয়ে যাবে। আমরা প্রায় দৌড়তে লাগলুম।

বন্দনাদি রোহিলাকে বললো, আপনি যদি রান্না না করে থাকেন, তাহলে রাত্তিরে ফিরে এসে আমার ওখানে খেয়ে নিতে পারেন। আমি বেশি করে রেঁধে রেখে এসেছি।

রোহিলা বললো, আমাকে তুমি আপনি বলছো কেন ? এই নীললোহিত, একে তুমি বলে দাও !

আমি বললুম, বন্দনাদি, এই মেয়েটির বয়েস মাত্র তিন বছর। সুতরাং ওকে আপনি বলার দরকার নেই।

রোহিলা বললো, আমাকে কেউ আপনি বলবে না। আমিও কারুকে আপনি বলতে পারি না।

আমি বললুম, তোমাদের বোম্বেতে মারাঠী ভাষায় বোধহয় আপনি শব্দটাই নেই।

রোহিলার বয়েস তিন বছর শুনেও বন্দনাদি চমকালো না। সঙ্গে সঙ্গে ঠিক আন্দাজ করে নিয়েছে। সে বললো, আপনি-টাপনি আমারও ঠিক পছন্দ নয়। এখানে বিশেষ কেউ বলে না।

নদীর ধারে আমরা অনেক মানুষের মাথা দেখতে পেলুম। আকাশে পাতলা জ্যোৎস্না, কিন্তু এখন দু'একটা মেঘও ঘোরাঘুরি করছে। একটা উঁচু পাথরের ওপর কেউ জ্বেলেছে একটা মশাল, সেখানে দাঁড়িয়ে একজন মহিলা ও দু'জন পুরুষ।

সামনে জমায়েত হয়েছে প্রায় পাঁচ-সাতশো মানুষ, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, কিশোর-কিশোরী, একেবারে বাচ্চা একটিও নেই। এরা কেউ কারুর সম্পর্কিত নয়, কে কোথা থেকে এসেছে, কেউ জানে না। কিসের জন্য এরা ঘর ছেড়েছে আর এখানে এসেই বা কী শান্তি পেয়েছে কে জানে !

এখন এই নদীরেখাঙ্কিত প্রান্তরে, জ্যোৎস্নার তলায় এই মনুষ্য সমাবেশটিকে কেমন যেন আদিম দুনিয়ার একটি দৃশ্য বলে মনে হয়। বিশেষত ঐ মশালটির জন্য। এখানে যারা রয়েছে, তাদের কেউ কেউ এককালে নাম-করা পণ্ডিত ছিল, কেউ উচ্চপদস্থ চাকুরে, কেউ কেউ শিল্পী, কেউবা উচ্চ সঙ্গতিসম্পন্ন পরিবারের সন্তান। কিন্তু এখানে কারুর কোনো আলাদা পরিচয় নেই। শুধু নাম ছাড়া, কারুর কোনো পদবীও শোনা যায় না।

বন্দনাদি বললো, ভিড়ের মধ্যে আমরা যদি হারিয়ে যাই তাহলে মিটিং শেষে আমরা ঐ যে লম্বা ইউক্যালিপটাস গাছটা, ওর তলায় মিট করবো, কেমন ?

রোহিলা আমার হাত চেপে ধরে বললো, আমার হারিয়ে যেতে ভয় করে। তুমি আমার পাশে পাশে থেকো।

উঁচু পাথরের ওপর একজন পুরুষ তিনবার মাদলের ধ্বনি দিতেই সব গুঞ্জন থেমে গেল। আমি জিজ্ঞেস করলুম, বন্দনাদি, ঐ ভদ্রলোক বুঝি এখানকার নেতা ?

বন্দনাদি ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বললো, চুপ !

উঁচু পাথরের মঞ্চ থেকে প্রথমে মহিলাটি বললো, নমস্কার। আপনারা সবাই এসেছেন আমাদের ডাক শুনে, সে জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের কয়েকটি ঘোষণা আছে। আজকের সন্ধেটি বড় সুন্দর, এখানে আমাদের ইচ্ছে মতন নাচ গানের অনুষ্ঠান হতে পারে। তার আগে আমরা সংক্ষেপে কাজের কথাগুলো সেরে নিই। প্রথমে বলবে, আপ্পা রাও।

আপ্পা রাও পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, সে নমস্কার করে বললো, আমার বক্তব্য আলু বিষয়ে।

শ্রোতাদের মধ্যে একটা হাসির হুল্লোড় পড়ে গেল।

আপ্পা রাও লোকটি বেশ রসিক। প্রথম বাক্যেই হাসি শুনে সে ঘাবড়ে গেল না। নিজেও হেসে বললো, আমি প্রেম বিষয়েই ভালো বলতে পারি, কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে আজ আমাকে আলু বিষয়েই বলতে হবে।

কেউ একজন চেঁচিয়ে বললো, বলুন, বলুন !

আপ্পা রাও বললো, আলু জিনিসটা বেশ সুস্বাদু, নানা রকম রান্নার কাজে লাগে আপনারা সবাই জানেন। আলু সেদ্ধ, আলু ভাজা, আলুর দম, মাংসের আলু, তরকারির আলু, কত দিক থেকে আলু আমাদের উপকারী। আলু বিষয়ে আমি একটা গান লিখেছিলুম, কিন্তু সুরটা ভুলে গেছি !

রোহিলা চোখ গোল গোল করে আমার দিকে তাকালো। যেন সে বলতে চায়, সন্ধেবেলা চাঁদের আলোয় মিটিং ডেকে এ আবার কী ধরনের কথাবার্তা ? খাদ্য বিষয়ে বেশি চিন্তা সে পছন্দ করে না।

আপ্পা রাও আবার বললো, কিন্তু তবু একটা কথা আছে। এবারে দেখা যাচ্ছে, অনেকেই ঘরে ঘরে আলুর চাষ করেছে। প্রচুর আলু জমে গেছে। এত আলু কেউ খাবে না। কেউ আর আলু নিতে চায় না। সেইজন্য অতিরিক্ত আলু শহরে গিয়ে বিক্রি করে আসতে হবে। এটাই আমার প্রস্তাব। কাল আমি শহরে যাবো, আপনাদের যার যার ঘরে অতিরিক্ত আলু আছে, আমার বাড়িতে কাল বিকেলের

মধ্যে জমা করে দিয়ে আসতে পারেন। শহর থেকে কিছু আনতে হলে সেই লিস্টিও পেশ করবেন। ব্যস, আমার কথা শেষ !

সবাই একসঙ্গে হাততালি দিয়ে উঠলো।

মহিলাটি ঘোষণা করলো, এবারের বক্তব্য রাখবেন ইসমাইল সাহেব।

ইসমাইল নামের ব্যক্তিটি একটুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো মাথা নিচু করে। তারপর হঠাৎ বেশ জোরালো গলায় গান শুরু করে দিল। গজল ধরনের গান। গজল শুনলেই আমার নিজেকে বেশ বোকা বোকা লাগে, কারণ ঐ গানের কথার এক বর্ণও মর্ম বুঝতে পারি না। অবশ্য ইসমাইল সাহেবের কণ্ঠস্বরটি সুরেলা।

দু'তিন মিনিট বাদেই গান থামিয়ে ইসমাইল বললো, এবারে একটা গল্প শুনুন। এক ছুতোর মিস্তিরির এক দজ্জাল বউ ছিল। বউটি অতি মুখরা। অনেকদিন সহ্য করার পর ছুতোর মিস্তিরি ভাবলো, আর নয়, এবারে একটা কিছু করতেই হবে। তখন থেকে সে বউকে খুন করার ফন্দী আঁটতে লাগলো। কী ভাবে খুন করবে শুধু সেই কথাই ভাবে। বিষ খাওয়াবে ? মাথায় হাতুড়ি মারবে ? গায়ে আগুন লাগিয়ে দেবে ? ঠিক মনস্থির করতে পারে না। একদিন এই সব কথা ভাবতে ভাবতে ছুতোর মিস্ত্রি নদীর ওপরের একটা সাঁকো পার হচ্ছিল। হঠাৎ পা পিছলে পড়ে গেল নদীতে। ছুতোর মিস্তিরি সাঁতার জানতো না ! ব্যস !

এই পর্যন্ত বলে থেমে গেল ইসমাইল সাহেব। আর কিছু বলে না।

দু'একজন জিজ্ঞেস করলো, তারপর ? তারপর ?

ইসমাইল বললো, নদীতে বেশি জল ছিল না। আর দু'জন জেলে সেখানে মাছ ধরছিল, তারা ছুতোর মিস্তিরিকে বাঁচিয়ে দিলো।

—তারপর ? তারপর ?

ইসমাইল সাহেব হেসে বললো, তারপর আবার কী ? আমি কি গল্প বানাতে জানি নাকি ? ছুতোর মিস্তিরির জীবন যেমন চলছিল তেমনই চলতে লাগলো।

একসঙ্গে হেসে উঠলো অনেকে।

ইসমাইল সাহেব বললো, সেই ছুতোর মিস্তিরি আর বউকে খুন করার কথা ভাবে না। আবার তারা ভালবাসতে শেখে। আমার নিজের জীবনেই এরকম ঘটেছিল। এবারে আমার বক্তব্য রাখি ? আমি আজ জঙ্গলে নীহারদাকে দেখতে গিয়েছিলাম। আপনারা সবাই জানেন, নীহারদা তিন দিন ধরে সেখানে শুয়ে আছেন। আজ আমি গিয়ে দেখলাম, তাঁর সময় ফুরিয়ে এসেছে, মনে হলো। তবে কষ্ট নেই। আমাদের মধ্যে একজন, যার সঙ্গে নীহারদার খুব কটু ঝগড়া হয়েছিল, নীহারদা তাকে ক্ষমা করেছেন। নীহারদা আমাকে সেই কথা

জানাতে বলেছেন। আসুন, আমরা সবাই উঠে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীহারদার জন্য দোয়া করি।

সবাই উঠে দাঁড়ালো কিন্তু শোকসভার মতন নীরবতা পালন করলো না। এক সঙ্গে বলতে লাগলো, নীহারদা ফিরে এসো, নীহারদা ফিরে এসো!

একটা ব্যাপারে আমি চমৎকৃত হলুম। এরা এখানে কোনো কাজের কথা নিছক কেজো ভঙ্গিতে বলে না। তার আগে একটু মজা করে গান গায়, গল্প বলে, এই প্রথাটা বেশ সুন্দর তো!

মহিলাটি বললো, এবারে আমার কথা। আমি আকাশ সম্পর্কে বলবো। আপনারা সবাই জানেন, পৃথিবীর প্রায় সব জন্তু মাথা নিচু করে চলে। তারা সব সময় মাটি দেখে। একমাত্র মানুষই যখন তখন আকাশ দেখতে পারে। তবু আমরা আকাশ দেখি না। যখন শহরে থাকি, তখন আকাশ দেখার কথা মনেই পড়ে না। শহরের আকাশের চেয়ে খোলা জায়গার আকাশ অনেক বেশি সুন্দর। এখানে এসেও আকাশ দেখে দেখে আমার আশ মেটে না। আমার গলায় সুর নেই, সে জন্য আমায় ক্ষমা করবেন, তবু আমি একটা ছোট্ট গান গাইছি। "এই তো তোমার আলোক ধেনু সূর্য তারা দলে দলে..."

মহিলা বিনয় করছিলো। তার গলা বেশ সুরেলা। গানটা সে গভীর উপলব্ধির সঙ্গে গাইলো, গাইতে গাইতে তার গলা বুজে এলো কান্নায়।

একটু থেমে, নিজেকে একটু সামলে নিয়ে সে বললো, আমার একটা সামান্য বক্তব্য আছে। কিন্তু সেটা আমি নিজের মুখে এখন বলতে পারছি না, ইসমাইল ভাই অনুগ্রহ করে বলে দিন।

ইসমাইল সাহেব গলা খাঁকারি দিয়ে সেই মহিলার কাঁধে হাত রেখে বললো, এই মেয়েটির নাম জ্যোৎস্না। ও আকাশ কত ভালোবাসে তা তো আপনারা শুনলেন। আমার তো মনে হয় ও সারা শরীরে সব সময় আকাশ শুষে নিতে চায়। খুব ঝড়-বৃষ্টি না হলে ও রাত্তিরেও দরজা-জানলা বন্ধ করে না। শুয়ে শুয়ে যতক্ষণ ও জেগে থাকে ততক্ষণ আকাশকে আড়াল করতে চায় না।

ইসমাইল সাহেব একটু থেমে সকলের দিকে তাকালো। তারপর জ্যোৎস্নাকে ইঙ্গিত করলো নিচে নেমে যেতে। হাত তুলে গুঞ্জন থামাবার অনুরোধ করে বললো, এবারে একটা দুঃখের কথা জানাবো। জ্যোৎস্না কাল রাতে ঘুমিয়ে পড়বার পর তার ঘরে একজন অতিথি এসেছিল। একজন অনাহূত অতিথি। তার উদ্দেশ্য ভালো ছিল না। তার কোনো কিছুর প্রয়োজন থাকলে সে জ্যোৎস্নাকে ডেকে তুলে চাইলেই পারতো। কিন্তু সে তা করেনি। জ্যোৎস্না

হঠাৎ জেগে উঠতেই সে জ্যোৎস্নাকে আক্রমণ করে। জ্যোৎস্না তাকে বাধা দেবার চেষ্টা করেও পারেনি। সে একজন পুরুষ এবং শক্তিশালী। এবং আমার ধারণা, সে বিকারগ্রস্ত। জ্যোৎস্না চিৎকার করে উঠতেই সে তার গলা চেপে ধরে। সে হয়তো জ্যোৎস্নাকে মেরেই ফেলতো, কিন্তু জ্যোৎস্নার চিৎকার শুনে পাশের বাড়ি থেকে একজন ছুটে আসে। তখন সে পালিয়ে যায়। আপনাদের মনে হতে পারে যে এর সবটাই জ্যোৎস্নার কল্পনা বা দুঃস্বপ্ন। কিন্তু আমরা কয়েকজন আজ সকালে জ্যোৎস্নার গলায় পাঁচ আঙুলের দাগ দেখেছি। তাছাড়া, আপনারা বিজয়বাবুর কাছ থেকে তাঁর অভিজ্ঞতা শুনুন। বিজয়বাবু, অনুগ্রহ করে একবার এখানে আসুন।

পা-জামা পাঞ্জাবি-পরা একজন লোক উঠে এসে বললো, আমি সংক্ষেপে যা দেখেছি তাই বলছি। আমি জ্যোৎস্নার কাছাকাছি বাড়িতে থাকি। বেশির ভাগ রাতেই আমি ঘুমোই না। দিনের বেলার চেয়ে রাত্তিরবেলা কাজকর্ম সারতেই আমার ভালো লাগে। কাল রাতেও আমি জেগেছিলাম। জ্যোৎস্নার বাড়ি থেকে এক সময় আমি একটা চাপা আর্তনাদ শুনতে পাই। সেই সঙ্গে একটা ভারি কিছু জিনিস পড়ে যাওয়ার শব্দ। কৌতূহলী হয়ে আমি এগিয়ে যাই ওর বাড়ির দিকে। প্রথমে বাড়ির মধ্যে ঢুকিনি, সামনের বাগানে দাঁড়িয়ে ডেকে বললাম, জ্যোৎস্না, জ্যোৎস্না, কী হয়েছে? তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে? কোনো উত্তর পেলাম না। তখনই একজন লোক ঝড়ের মতন জ্যোৎস্নার ঘর থেকে বেরিয়ে ছুটে পালালো। আমি তাকে ধরার সুযোগ পাইনি। তার মুখটাও দেখা যায়নি। কাল রাতে আকাশ মেঘলা ছিল। তখন আমি জ্যোৎস্নার ঘরে ঢুকে দেখলাম, সে প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। আমি তার চোখে মুখে জলের ছিটে দিই। আমার ধারণা, একজন সাংঘাতিক ধরনের আগন্তুক এসেছিল জ্যোৎস্নার ঘরে। আমাদের মধ্যে যদি এরকম কোনো মনোরোগী থেকে থাকে, তাহলে সেটা খুব দুশ্চিন্তার কথা। আমরা অনেকেই রাত্তিরে দরজা-জানলা বন্ধ করি না। এখন থেকে কি ভয়ে ভয়ে রাত কাটাতে হবে?

সবাই কয়েক মুহূর্ত একেবারে বজ্রাহতের মতন চুপ। যেন এরকম অবিশ্বাস্য কাহিনী তারা আগে কখনো শোনেনি। তারপরেই শুরু হয়ে গেল পারস্পরিক আলোচনা।

রোহিলা আমাকে খানিকটা হতাশভাবে জিজ্ঞেস করলো, যাঃ! এখানেও এই কাণ্ড হয়?

আমি বললুম, স্বর্গেও মাঝে মাঝে দৈত্যরা গিয়ে উপদ্রব করে।

বন্দনাদিকে একজন কে যেন জোর দিয়ে বললো, আমাদের মধ্যে এরকম

কোনো ম্যানিয়াক থাকতেই পারে না। এ নিশ্চয়ই বাইরের কোনো লোকের কাজ। চুপি চুপি ঢুকে পড়েছে।

বন্দনাদি আমার দিকে তাকাতেই আমি বললুম, আমি কিন্তু আজ দুপুরে এসেছি। কাল ছিলাম অনেক দূরে।

বন্দনাদি হাসি মুখে বললো, তোকে মঞ্চে তুলে দেবো ? সেখানে দাঁড়িয়ে তুই সবার সামনে নিজেকে ডিফেন্ড কর!

—আগে আমার নামে কেউ অভিযোগ আনুক!

রোহিলা বললো, না, এ ছেলেটা সে রকম নয়। এ আজ একা অনেকক্ষণ আমার ঘরে ছিল। আমি বাবা রাত্তিরে দরজা বন্ধ করে শোবো।

বন্দনাদি বললো, বাইরের লোক বলে মনে হয় না। এখানকারই কেউ। কয়েকদিন ধরেই আমার বারবার মনে হচ্ছে, এখানে একটা খারাপ কিছু ঘটবে।

বন্দনাদির পাশে একজন মাঝবয়েসী মহিলা ম্লান মুখে বললেন, আমার খুব মন খারাপ লাগছে। কেন জানো ? এই একটা বাজে বিষয় নিয়ে এখন আমাকে চিন্তা করতে হবে। আমার মন থেকে আমি এই সব জিনিসগুলো একেবারে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম!

মহিলাটিকে মা-মা দেখতে। লাল পাড় শাড়ি পরা। তিনি কেন বাড়ি-ঘর ছেড়ে এখানে চলে এসেছেন ? গল্পটা জানার জন্য আমার সঙ্গে সঙ্গে কৌতূহল হয়। কিন্তু উপায় নেই।

পাথরের মঞ্চ থেকে ইসমাইল সাহেব আবার সবাইকে চুপ করতে অনুরোধ জানালেন। তারপর হাত জোড় করে বললেন, মিটিং শেষ করার আগে শুধু আর একটাই কথা আছে। আমাদের অনেকেরই ধারণা, জ্যোৎস্নার ঘরে কাল রাতে যে এসেছিল, সে বাইরের লোক নয়, সে আমাদেরই এখানকার একজন। হয়তো সে অসুস্থ কিংবা পুরনো জীবনের টানে হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় এরকম কিছু করে ফেলেছে। সে দোষ স্বীকার করলে জ্যোৎস্না তাকে ক্ষমা করবে বলেছে। সর্বসমক্ষে দোষ স্বীকার করারও দরকার নেই। শুধু রজতদার কাছে নিরালায় দেখা করে বললেই চলবে। আপনারা অনেকেই হয়তো জানেন, রজতদা একসময় বিখ্যাত ডাক্তার ছিলেন, তিনি সেই ব্যক্তিকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। আজকের সভা এখানেই শেষ!

আর একটা ব্যাপার আমার অদ্ভুত লাগলো। যে-তিনটি বিষয় নিয়ে আলোচনা হলো, তার মধ্যে জ্যোৎস্নার ব্যাপারটাই নিশ্চয়ই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। অথচ সে কথাটা প্রথমেই তোলা হয়নি।

সভা ভঙ্গ হবার পর অনেকেই ছড়িয়ে পড়লো ছোট ছোট দলে। জ্যোৎস্নার ঘটনা শুনে সবাই যে খুব উদ্বিগ্ন তা মনে হলো না। দু' এক জায়গায় শোনা গেল স্বতঃস্ফূর্ত গান। তীক্ষ্ণ হাসির শব্দ।

আমার খুব ইচ্ছে করলো, জ্যোৎস্না নামের মেয়েটিকে কাছাকাছি গিয়ে দেখতে। কিন্তু এখন এই ভিড়ের মধ্যে কোথায় তাকে খুঁজে পাবো ?

॥ ৭ ॥

ফেরার পথে আমাদের আর একজন সঙ্গী জুটলো। তার নাম জয়দীপ। দীর্ঘকায় পুরুষ, প্যান্টের ওপর পাঞ্জাবি পরা, অসম্ভব গম্ভীর ধরনের। ঠিক গাম্ভীর্যও নয়, তার মুখে যেন বিমর্ষতার ছাপ।

সভা শেষ হয়ে যাবার পর আমরা আরও প্রায় এক ঘন্টা সেখানে ছিলাম। বন্দনাদির অনেকের সঙ্গেই চেনা, তাই তাকে বেশ কিছুক্ষণের জন্য দেখা যায়নি, রোহিলা নিজের থেকে কারুর সঙ্গে আলাপ জমাতে পারে না বলে সে দাঁড়িয়েছিল আমার হাত ধরে। শেষ পর্যন্ত আমরা ইউক্যালিপটাস গাছটার তলায় বসে পড়েছিলাম।

আমাদের খুব কাছেই মাটির ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে ছিল সতেরো-আঠেরো বছরের একটি কিশোর। টানা টানা দুটি চোখ, সে দেখছিল মেঘের খেলা। এই রকম মুখ দেখলেই চমকে উঠতে হয়। মনে হয় যেন কতবার খবরের কাগজে এই মুখখানাই ছাপা দেখেছি, যার তলায় লেখা থাকে, কিশোর, ফিরে এসো, তোমাকে কেউ ভুল বোঝেনি, মা মৃত্যুশয্যায়, কত টাকা পাঠাতে হবে সত্বর জানাও!

মা-বাবাকে চরম দুশ্চিন্তায় ফেলে রেখে এই কিশোরটি কেন এখানকার মাঠে নিশ্চিন্তভাবে শুয়ে আছে ? এই সব পলাতকেরা কী করে দিকশূন্যপুরের সন্ধান পায় ?

আমি কিশোরটির চোখে চোখ ফেলে একবার বলেছিলুম, মেঘ জমছে, আজ আবার বৃষ্টি হবে মনে হচ্ছে, তাই না ?

কিশোরটি কোনো উত্তর না দিয়ে উদাসীন চোখে তাকায়।

আমি আবার তার সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের উদ্দেশ্যে বলেছিলুম, আমি আজই এখানে পৌঁছেছি। কলকাতায় এখন খুব ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছে। কত গাছ উল্টে পড়েছে।

কলকাতার খবর, বাইরের পৃথিবীর খবর সম্পর্কে কোনো আগ্রহই নেই, ঐ টুকু ছেলের মনে কী এমন বৈরাগ্য ?

সে আস্তে আস্তে উঠে চলে গিয়েছিল সেখান থেকে।

রোহিলা বলেছিল, আহা রে !

আমার বেশ রাগ হয়ে গিয়েছিল। আমি বলেছিলুম, আহা রে আবার কী ! এ ছেলেটা হয়তো পরীক্ষায় ফেল করে বাড়ি থেকে পালিয়েছে, তারপর এখানে এসে দিব্যি মজায় আছে। পড়াশুনোর চিন্তা নেই।

রোহিলা চোখ বড় বড় করে আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, পড়াশুনো কি সবাইকে করতেই হবে ? পড়াশুনো না করলে কী ক্ষতি হয় ? কেউ যদি গাছ পুঁতে তাতে ফল ফলাতে ভালোবাসে, তাকেও বই মুখস্থ করতে হবে ? নীললোহিত, তুমি একী বললে ?

আমি তৎক্ষণাৎ লজ্জা পেয়ে গিয়েছিলুম। আমার অত অভিভাবকগিরি করার কী দরকার ? পড়াশুনোয় ফাঁকি মারার সুযোগ পেলে আমিও কি কখনো ছেড়েছি। আসলে আমি বাইরের লোক বলে ওর বাবা-মায়ের পক্ষ নিতে চাইছিলুম।

এমনও তো হতে পারে, ঐ ছেলেটির বাবা-মা প্রতিদিন ঝগড়া করে ঘরের ছাদ ফাটায়। সন্ধেবেলা পার্টিতে যায়, গভীর রাতে ফিরে এসে কদর্যভাষায় পরস্পরের নামে দোষারোপ করে। তাদের ছেলে-মেয়ে সেই সময় কাঁচা ঘুম ভেঙে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে। ছেলেটি সে রকম বিষাক্ত পরিবেশ ছেড়ে চলে এসেছে। সে রকম পরিবারও আমি দেখিনি কি ? দেখেছি !

তবু, ছেলেটি কেন আমার সঙ্গে কথা বললো না !

বন্দনাদি এক সময় জয়দীপকে সঙ্গে এনে বলেছিল, চল, এবার ফিরি।

আমাদের সঙ্গে জয়দীপের আলাপ করিয়ে দিলে সে নমস্কার করার জন্য হাতও তোলে না, শুধু মাথা নাড়ে।

অন্য একটা পথ দিয়ে ফিরতে ফিরতে আমার চোখে পড়লো একটা গীর্জা। মাঝারি ধরনের, সরু চূড়া, ওপরের দিকে একটা ঘড়িও লাগানো আছে, তবে তার একটাও কাঁটা নেই।

এখানেও ধর্মস্থান আছে ? আগে তো দেখিনি।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, বন্দনাদি, এটা কে বানিয়েছে ?

বন্দনাদি বললো, আমরা বানাইনি। এই দিকশূন্যপুর কলোনিটাও তো আমরা বানাইনি, বৃটিশ আমলের। তখন যারা ছিল, তারা গীর্জা ছাড়া শহর বানাতো না !

—এই গীর্জায় এখনো কেউ যায় ?

—যায় কেউ কেউ। মাঝে মাঝে ঘণ্টার শব্দ শুনতে পাই। আমিও এসেছি কয়েকবার। যীশুর যে কোনো মূর্তিতেই মুখখানা এমন শান্ত যে দেখতে ভালো লাগে।

রোহিলা কপাল ও বুকে আঙুল ছুঁইয়ে ক্রুশ চিহ্ন আঁকলো।

তা হলে কি ও তিন বছর আগে ক্রিশ্চিয়ান ছিল ? সে কথা জিজ্ঞেস করবার আগেই জলদগম্ভীর স্বরে জয়দীপ বললো, আমি প্রথম এসে এখানে কোনো বাড়ি খালি পাইনি। তখন এই গীর্জার মধ্যে শুয়ে থাকতাম।

বন্দনাদি বললো, তখন তুমি কোনো অলৌকিক স্বপ্ন দেখোনি ?

জয়দীপ বললো, আমি জেগে জেগেই অনেকরকম স্বপ্ন দেখি ! আমার কাছে এই জগৎটাই একটা স্বপ্ন।

আমি ইয়ার্কির লোভ সামলাতে পারলুম না। ঐ কথা শোনা মাত্র পট্ করে জিজ্ঞেস করলুম, আপনি রূপনারায়ণ নদীর নাম শুনেছেন ?

জয়দীপ ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলো, রূপনারায়ণ নদী ? হ্যাঁ, নাম শুনেছি। বেঙ্গলে তো, তাই না !

আমি বললুম, হ্যাঁ। একদিন ঐ রূপনারায়ণ নদীর ধারে আপনার ঘুমিয়ে পড়া উচিত ছিল। তারপর জেগে উঠলে ঠিক বুঝতে পারতেন, এ জগৎটা স্বপ্ন নয়। শুধু ঐ নদীর ধারে ঘুমোবার পর জেগে উঠলেই এরকম উপলব্ধি হয়।

—তার মানে ?

রোহিলাও মানে বুঝতে পারেনি, তারও চোখেমুখে কৌতূহল।

বন্দনাদি বললো, নীলুটা তোমার সঙ্গে হেঁয়ালি করছে। জয়দীপ, তুমি তো রবীন্দ্রনাথের লেখা পড়োনি। তাঁর একটা কবিতা আছে :

> রূপনারাণের কূলে
> জেগে উঠিলাম
> জানিলাম এ জগৎ
> স্বপ্ন নয়

রোহিলা বললো, নদীটার নাম বড় সুন্দর। ইস, আমি কেন ঐ নদী দেখিনি !

আমি বললুম, আমি কখনো কোনো গীর্জার মধ্যে ঘুমোইনি। তবে একবার তাজমহলে গিয়ে রাত্তিরে আর ফিরিনি, চাতালটাতেই শুয়ে ছিলাম। ওঃ, কী দুর্দান্ত স্বপ্ন দেখেছিলুম সে রাতে। আমি শাজাহান আর স্বয়ং মমতাজ বেগম সোনার পাত্রে আমাকে সিরাজী ঢেলে দিচ্ছে !

বন্দনাদি বললো, তুই আর গুল ঝাড়িস না, নীলু !

রোহিলার তো মাত্র তিন বছর বয়েস, সে সব কিছুতেই অবাক হয়। সে ভুরু

তুলে বললো, তুমি সত্যি তাজমহলে ঘুমিয়েছিলে, না ঘুমোওনি ?

আমি বললুম, আমি সত্যি একবার সেখানে সারা রাত শুয়ে থেকেছি, আর ঐ স্বপ্নটা নিজে তৈরি করেছি। চোখ বুজে যে-কোনো স্বপ্নই তো তৈরি করা যায়।

রোহিলা বললো, সেটা সত্যি। খুব সত্যি। ইস, আমি কেন একদিন তাজমহলে ঘুমোইনি ?

বন্দনাদি এমনভাবে রোহিলার দিকে তাকালো যেন বলতে চাইলো, ইচ্ছে করলে তুমি এখনো তাজমহলে চলে যেতে পারো। কেউ তোমাকে বাধা দেবে না।

রোহিলা সেই অর্থ গ্রহণ করলো না। সে আপন মনে বললো, এখানকার নদীটাও বেশ সুন্দর। একদিন ঐ নদীর ধারে সারা রাত শুয়ে থাকলে হয় না ?

আমি বললুম, জ্যোৎস্নার ঘরে যে আততায়ী এসেছিল কাল রাত্রে, তাকে কেউ এখনো চিনতে পারেনি, সে এখনো ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ভয়ে কেঁপে উঠে রোহিলা বললো, না, না, আমি একা শুতে পারবো না। আমরা সবাই মিলে !

বন্দনাদি বললো, একটা পাগলকে আমরা ভয় পাবো কেন ? হ্যাঁ নদীর ধারে শুয়ে থাকা যেতে পারে।

রোহিলা বললো, আজ রাত্তিরেই ?

বন্দনাদি বললো, যদি বৃষ্টি না হয় !

সবাই একসঙ্গে আকাশের দিকে তাকালাম। হয়তো সবারই মনে পড়লো জ্যোৎস্নার কথা। তার আকাশ-প্রীতি বোধহয় একটু বাড়াবাড়ির পর্যায়ে পড়ে। যতই নিরাপত্তা থাকুক, তবু কোনো যুবতী মেয়ে ঘরের দরজা খুলে ঘুমোয়, এরকম কখনও শুনিনি। অবশ্য, সামাজিক অর্থে যাদের স্বাভাবিক মানুষ বলে, এখানকার কেউই বোধহয় সে রকম নয়।

আকাশে মেঘের আনাগোনা বেড়েছে। জ্যোৎস্না হারিয়ে যাচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে।

বন্দনাদির বাড়ির টিলাটার কাছে এসে বললুম, তোমার ঐ অঙ্কের পণ্ডিত বৃদ্ধকে তো মিটিং-এ দেখতে পেলুম না। উনি গিয়েছিলেন ?

বন্দনাদি বললো, আমিও দেখিনি।

—অত বুড়ো মানুষ, একলা থাকেন কী করে ?

—পাহাড়ে আরও বুড়ো বুড়ো সন্ন্যাসীরা থাকে না ?

—যদি কখনো অসুস্থ হয়ে পড়েন ?

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বন্দনাদি বললো, দাঁড়া, একটু দেখে আসি। আহা, আমায় কত ভালোবাসে, বিয়ে করতে চায়—

কুয়োর পাশ দিয়ে বন্দনাদি এগিয়ে গিয়ে ঢুকে পড়লো বৃদ্ধের বাগানে। ডাকলো না। একটা খোলা জানলার নিচে দাঁড়ালো।

একটু পরে হাসি মুখে ফিরে এসে বললো, নাক ডাকছে, তার মানে দিব্যি আরামে ঘুমোচ্ছে।

জয়দীপ জিজ্ঞেস করলো, আমি কি এবার বাড়ি যাবো ?

বন্দনাদি বললো, কেন, তুমি এসো। আমাদের সঙ্গে কিছু খেয়ে নেবে।

জয়দীপ যেন কী সব চিন্তা করলো, আমার আর রোহিলার মুখের দিকে তাকালো। তারপর আবার বললো, যাবো ?

বন্দনাদি তার হাত ধরে বললো, এসো !

এখানে একটা সুবিধে এই, কারুর বাড়িতেই কেউ প্রতীক্ষায় বসে নেই। বেশি রাত করে বাড়ি ফিরলেও অন্য কেউ চিন্তা করবে না বা বকুনি দেবে না। কিন্তু এখানে কি কারুর সঙ্গে কারুর প্রেম হয় না ! আমি আর রোহিলা সঙ্গে আছি বলেই কি জয়দীপ বন্দনাদির সঙ্গে যেতে ইতস্তত করছে !

ওপরে উঠে এসে বন্দনাদি মোমবাতি জ্বাললো।

রোহিলা বললো, এ বাড়িটা কী সুন্দর ! এখান থেকে অনেক দূর দেখতে পাওয়া যায়। ঐ যে ঐ তো নদী।

জয়দীপ আমার দিকে তাকিয়ে ধমকের সুরে জিজ্ঞেস করলো, এ জগৎটা স্বপ্ন নয়, না ?

আমি বললুম, রবীন্দ্রনাথের মতন কবি তা মানতে চাননি। তবে দার্শনিকরা তো অনেকেই ঐ কথা বলেন... কবিদের কথা বাদ দিন !

বারান্দা থেকে বন্দনাদি বললো, জানিস নীলু, আমাদের এখানে কিন্তু একজনও কবি নেই। কবিরা ভাবজগত নিয়ে কারবার করলেও তারা কিন্তু ঘোর সংসারী। কেউ বাড়ি ছেড়ে চলে যায় না।

আমি বললুম, কবিদের চিনবে কী করে ? কবিতা লেখা বন্ধ করে দিলে কবিদের তো চেহারা দেখে চিনতে পারার উপায় নেই।

—কেন, কবি-কবি চেহারা দেখলেই চেনা যায় !

—যাদের কবি-কবি চেহারা তারা সাত জন্মে কবিতা লিখতে পারে না। কে যেন একজন বলেছিলেন যে, জীবনানন্দ দাশের চেহারা খেয়া নৌকোর মাঝির মতন ! আর একালের কবিরা তো... সব ভিড়ে মিশে থাকে !

—সে যাই বলিস, এখানে কোনো কবি থাকলে ঠিক টের পাওয়া যেত।

—এখানে এলে সবাই বোধহয় দার্শনিক হয়ে যায়।

—দার্শনিক কাদের বলে আমি জানি না। আয়, আগে খেয়ে নেওয়া যাক।

বন্দনাদি এক ডেকচি খিচুরি রেঁধে রেখেছিল, সেটা গরম করে নেওয়া হলো। তারপর বেশ কিছু আলু আর পেঁয়াজ মিশিয়ে ভাজা। আমার আবার কাঁচা লঙ্কা ছাড়া চলে না। তাও রয়েছে।

বারান্দায় বসে ডেকচিটা মাঝখানে রেখে ছোট ছোট প্লেটে তুলে তুলে খেতে লাগলুম। হঠাৎ এক সময়ে খাওয়া থামিয়ে রোহিলা এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো মাটির দিকে।

বন্দনাদি বললো, কী হলো ? তুমি মোটে ঐটুকু নিয়েছো, আরও নাও।

রোহিলা বাহু দিয়ে চোখ চেপে ধরে ধরা গলায় বললো, আমার এত আনন্দ হচ্ছে যে, কান্না পেয়ে যাচ্ছে। খেতে পারছি না। একবেলা আগেও তোমাদের কারুকে চিনতুম না। অথচ এখন কত সুন্দরভাবে একসঙ্গে খাচ্ছি··· আগে কোনোদিন জানতুম না, মানুষ এত সহজ হতে পারে।

চোখ তুলে সে আবার বললো, তোমরা জানো না, আমার আগের জীবনটা কী সাংঘাতিক ছিল। সব সময় স্বার্থ আর হিংসে !

বন্দনাদি নরম গলায় বললো, তুমি এখানে সবে এসেছো তো, তাই পুরোনো কথা মনে পড়ছে। আর কিছুদিন বাদে, যত বেশি আগেকার জীবনটা ভুলে যেতে পারবে, দেখবে ততই বেশি সুন্দর হচ্ছে এখনকার জীবনটা।

আমি নিরীহভাবে জিজ্ঞেস করলুম, এখানে বুঝি কেউ কারুকে হিংসে করে না ?

বন্দনাদি বললো, সকলের মনের কথা কি আমি জানি ? তবে আমার সে-রকম কোনো অভিজ্ঞতা হয়নি।

জয়দীপ প্রায় কটমট করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। এই লোকটি প্রথম থেকেই কেন যেন অপছন্দ করেছে আমাকে। এটা ঠিক বোঝা যায়। বিষণ্ণতার বদলে ওর মুখে এখন একটা অপ্রসন্ন ভাব। সে বললো, হাওয়া থেমে গেছে, আকাশে একটাও তারা দেখা যাচ্ছে না। তুমি কেন ঐ কথাটা বললে ?

—কোন্ কথাটা ?

—এখানে হিংসে আছে কি না ! তুমি কি গুপ্তচর ?

—না, না, আমি সে রকম কিছু ভেবে বলিনি !

জয়দীপ আবার আকাশের দিকে তাকালো। যেন মেঘ এসে তারা ঢেকে দেওয়ার জন্য আমিই দায়ী।

তারপর সে বন্দনাদির দিকে ফিরে বললো, জানো বন্দনা, আমার জন্য সারা

ভারতবর্ষে স্পাই ঘুরছে। একদিন না একদিন এখানেও তারা আসবে। আমাকে ছাড়বে না।

বন্দনাদি বললো, কেন ? তোমার জন্য স্পাই ঘুরছে কেন ?

—আমি যে একটা ভীষণ গোপন কথা জানি। স্টেট সিক্রেট। আমি না মরে গেলে ওরা নিশ্চিন্ত হবে না ! যদি কেউ একবার বলে দেয় যে আমি এখানে আছি, তা হলে ওরা ঠিক শিকারী কুকুরের মতন ছুটে আসবে।

বন্দনাদি জয়দীপের পিঠে মমতামাখা হাত রেখে বললো, না, জয়দীপ, এখানে কেউ আসবে না।

সে তবু আমার আর রোহিলার মুখের দিকে পর্যায়ক্রমে তাকাতে লাগলো।

রোহিলা বললো, তুমি কী গোপন কথা জানো ? সবাইকে বলে দাও তা হলে আর সেটা গোপন থাকবে না !

জয়দীপ গর্জন করে উঠলো, তুমি কেন এই কথা বললে ? তুমি কেন এই কথা বললে ? তুমি কে ?

রোহিলা তাতে একটুও ভয় না পেয়ে খিল খিল করে হেসে বললো, আমি গুপ্তচর ! আমি গুপ্তচর ! ধরা পড়ে গেছি !

জয়দীপ হাতের প্লেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিল, খান খান শব্দে সেটা ভাঙলো। সে উঠে দাঁড়াতে যেতেই বন্দনাদি তার হাত ধরে টেনে বললো, আঃ জয়দীপ, কী ছেলেমানুষী করছো ? বসো !

—না, আমি বসবো না। এরা, এরা আমায় বাঁচতে দেবে না !

—বসো বলছি, নইলে মার খাবে আমার কাছে !

জয়দীপ তবু বন্দনাদির হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বাগানের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালো। দু হাতে মাথা চেপে ধরে সে কর্কশ গলায় বললো, আমাকে ওরা বাঁচতে দেবে না ! আমি আর কিছু চাই না, শুধু নিরিবিলিতে নিজের মতন থাকতে চাই, তবু ওরা আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে যেতে চায়। আমাকে বড় চাকরির লোভ দেখায়। বন্দনা, তুমি কেন আমায় এখানে ডেকে আনলে ?

—জয়দীপ, তুমি ভুল ভাবছো। এখানে কেউ তোমার খারাপ চায় না। এসো, খাবারটা শেষ করে নাও। তোমাকে আমি আর একটা প্লেট দিচ্ছি !

—নাঃ !

বন্দনাদি উঠে দাঁড়াবার আগেই জয়দীপ দৌড়ে চলে গেল, মিলিয়ে গেল অন্ধকারে। বন্দনাদি খানিকটা এগিয়ে গিয়ে টর্চ জ্বেলে কয়েকবার ডাকলো ওর নাম ধরে। কোনো উত্তর এলো না।

বন্দনাদি ফিরে এলে রোহিলা বাচ্চা মেয়ের মতন ভীতু ভীতু গলায় জিজ্ঞেস করলো, আমি কোনো দোষ করেছি ?

বন্দনাদি বললো, না, তুমি কোনো দোষ করোনি। জয়দীপের এক এক সময় এই রকম হয়, ঠাট্টা-ইয়ার্কি কিছু বোঝে না !

রোহিলা বললো, খিচুড়িটা আমার খুব ভালো লাগছে। আমি আর একটু খেতে পারি ? আমার আস্তে আস্তে খাওয়া অভ্যেস।

—হ্যাঁ, খাও ! বাঃ, খাবে না কেন ? সবটা শেষ করতে হবে।

আমার খাওয়ার ইচ্ছে ঘুচে গেছে। একটা কু-চিন্তা ঝিলিক মারছে মাথার মধ্যে। এই জয়দীপ যে এক ধরনের পাগল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। গুপ্তচর-ভীতি খুব সাধারণ এক রকম পাগলামির লক্ষণ। কাল রাত্রে জ্যোৎস্না নামের ঐ মেয়েটির ঘরে এই জয়দীপই যায় নি তো ? এদের যে কার ওপর কখন সন্দেহ হয় তার তো ঠিক নেই।

বন্দনাদি বললো, কাল সকালে দেখবি, ও একেবারে অন্য মানুষ !

আমি জিজ্ঞেস করলুম, রোজ রাত্তিরেই এই রকম হয় নাকি ?

—না, না, রোজ নয়। মাঝে মাঝে। ও কারুর সঙ্গে ভালো করে মিশতে পারে না। সেই জন্যই আমি ওকে ডাকি, লোকজনের সঙ্গে থাকলে ভালো থাকে।

—আজকে আমাদের থাকাটাই ওর অপছন্দ হয়েছে। হয়তো তোমাকে একা পেতে চেয়েছিল।

বন্দনাদি গাঢ় চোখে তাকালো আমার দিকে। তারপর হেসে বললো, নাঃ, সে রকম কিছু না।

এই সময় বৃষ্টি নামলো ঝির ঝির করে।

রোহিলা বললো, যাঃ, তা হলে আজ আর নদীর ধারে শোওয়া হলো না। আমি তা হলে কোথায় ঘুমোবো ?

বন্দনাদি বললো, বৃষ্টি থামুক, তারপর নীলু তোমায় বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসবে।

একটু থেমে বন্দনাদি আবার বললো, নীলু, তুই ইচ্ছে করলে ওখানে থেকেও যেতে পারিস। আবার কেন কষ্ট করে এতটা ফিরে আসবি ?

আমার একটু ধাঁধা লাগলো। বন্দনাদি কি চায় না যে আমি রাত্রে এখানে থাকি ? আগেরবার তো এই বাড়িতেই ছিলাম।

আবার মাদলের শব্দ শোনা গেল।

বন্দনাদি বললো, এই রে !

আমি জিজ্ঞেস করলুম, আবার মিটিং ডাকছে নাকি ?

বন্দনাদি চিন্তিত ভাবে বললো, না। একদিনে দু'বার মিটিং হবে না। কেউ সাহায্য চাইছে। এখানে তো আর অন্য কোনো ব্যবস্থা নেই, কারুর কোনো বিপদ হলে এই ভাবে অন্যদের ডাকে।

—প্রত্যেক বাড়িতে মাদল আছে নাকি ?

—সব বাড়িতে না থাকলেও প্রত্যেক পাড়ায় একটা দুটো করে আছে। আমি টিলার ওপরে থাকি, আমার বাড়িতে একটা রেখেছি।

—চলো, তা হলে যাই।

—থাক, আমাদের যাবার দরকার নেই। শব্দটা অনেক দূরে। ওদিককার পুরুষরা যাবে।

ঘন, নিশ্ছিদ্র স্তব্ধতার মধ্যে সেই মাদলের শব্দটা অত্যন্ত গম্ভীর, মনে হয় যেন নিয়তির সঙ্কেত। আমরা একটুক্ষণ চুপ করে শুনলাম সেই শব্দ। কী হয়েছে ওখানে ? কাল রাতে জ্যোৎস্না নামে মেয়েটির যা হয়েছিল, সেইরকম কিছু ? জয়দীপ ?

আওয়াজটা একটু পরেই থেমে গেল।

রোহিলা বললো, আমার ভয় করছে !

বন্দনাদি বললো, সে রকম ভয়ের কিছু নেই। হয়তো কেউ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে।

—এখানে অসুখ করলে তোমরা জঙ্গলে ফেলে দিয়ে আসো ?

—ধ্যাৎ ! কে বলেছে তোমাকে এসব কথা ? ফেলে দিয়ে আসা হবে কেন ! এখানে কারুর ওপরেই কোনো ব্যাপারে জোর জবরদস্তি করা হয় না ! কেউ যদি চায়, ঘরে শুয়েই মরতে পারে। তবে বেশি অসুখ হলে, হাঁটা চলার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গেলে অনেকেই চায় জঙ্গলে গিয়ে শুয়ে থাকতে। আগেকার দিনেও তো লোকে মৃত্যুর আগে বনে চলে যেত।

—আমার একলা থাকতে বড্ড ভয় করে।

—তুমি এক কাজ করো। তুমি এই নীলুকে ধরে রেখে দাও তোমার কাছে। ওকে আর ফিরে যেতে দিও না !

এবারে আমি বললুম, তোমার ব্যাপার কী বলো তো বন্দনাদি ? আমি তোমার বাড়িতে থাকলে তোমার কোনো অসুবিধে হবে মনে হচ্ছে !

বন্দনাদি হেসে উঠলো।

—তুই ভাবছিস বুঝি, রাত্তিরবেলা গোপনে গোপনে আমার কোনো প্রেমিক আসবে, তুই থাকলে অসুবিধে ! সেই রকম কারুর আসবার কথা থাকলেও আমি তা তোর কাছে গোপন করবো কেন ? তুই কি আমার গার্জেন ? আমি জীবনে কোনোদিনই কিছু গোপন করিনি।

—হ্যাঁ, একটা ব্যাপার গোপন করেছো ?

—কী !

—বলবো ? আজও কেউ জানে না, রূপসার বাবা কে !

—নীলু ! তোকে বারণ করেছি না কোনোদিন তুই আমার কাছে ঐ প্রসঙ্গ তুলবি না !

—অত রেগে যাচ্ছো কেন ? এই হাসছো, এই রাগ করছো, ব্যাপারটা কী তোমার ?

রোহিলা বন্দনাদির পক্ষ নিয়ে আমার প্রতি ভর্ৎসনার সুরে বললো, এই নীলু, তুমি কেন বন্দনাদির মনে দুঃখ দিচ্ছ ? বন্দনাদি খুব সাচ্চা মেয়ে, আমি এক নজর দেখেই বুঝে নিয়েছি।

আমি বললুম, না, আমি কষ্ট দিতে চাইনি। তবে মানুষের কৌতূহল প্রবৃত্তিটা বড্ড স্ট্রং। কৌতূহল আছে বলেই তো মানুষ জাতি এত কিছু আবিষ্কার করেছে।

রোহিলা বললো, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে মানুষ নিজের সর্বনাশও ডেকে এনেছে।

বন্দনাদি ঝাঁঝালো গলায় বললো, অন্যের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কৌতূহল দেখানোটা সভ্যতার লক্ষণ নয়। আমরা এখানে ঐ রকম কৌতূহল প্রবৃত্তির প্রশ্রয় দিই না।

—তুমি তো জানোই, আমি সভ্য নই। যাই হোক, আজ রাত্তিরে এখানে আর কারুর আসবার কথা আছে কি নেই ?

—যে-কেউ এসে পড়তে পারে। কোনো বাধা তো নেই। তুই ঠিক বুঝবি না, নীলু। এখানে যারা আসে তারা সবাই পোড় খাওয়া মানুষ। তাই কেউ আর এখানে চট করে প্রেমে পড়তে চায় না। আমার অনেক বন্ধু আছে এখানে, কিন্তু প্রেমিক-ট্রেমিক কেউ নেই।

রোহিলা বললো, আমার কিন্তু খুব প্রেম করতে ইচ্ছে করে। জীবনে আমি কখনো প্রেম পাইনি। শুধু লোভ, শুধু লোভ। ও বন্দনাদি, আমার প্রেম হবে, নাকি এমনি এমনি মরে যাবো ?

বন্দনাদি আবার হাসলো। রোহিলার থুতনি ছুঁয়ে বললো, এই মেয়েটা সত্যি

একেবারে বাচ্চা ! হ্যাঁ, তোমার প্রেম হবে। কেন হবে না ? তবে ঐ নীলুটার ওপর বেশি ভরসা করো না।

—কেন, ও বুঝি ডরপুক ?

—ওকে দু হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরতে গেলেই ও ফুরুৎ করে উড়ে পালিয়ে যায়।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললুম, হায় রে, সে রকম বাহুবন্ধন পেলাম কোথায় যে পালাবো ?

হঠাৎ একটা শব্দ হতেই আমরা তিনজন সচকিত ভাবে তাকালুম বাইরের দিকে। কেউ একজন আসছে। অন্ধকারের মধ্যে, একজন মানুষ বাগানের প্রান্তে এসে দাঁড়ালো।

গা-টা ছমছম করে ওঠে। মনে পড়ে মাদলের ডাক।

বন্দনাদি জিজ্ঞেস করলো, কে ? কে ওখানে ?

উত্তর না দিয়ে লোকটি ছুটে এলো। আমি সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালুম, এখানে আমি একমাত্র পুরুষ মানুষ, প্রতিরক্ষার দায়িত্ব আমারই নেওয়া উচিত।

কাছে আসতে জয়দীপকে চেনা গেল। হাত জোড় করে বললো, বন্দনা, আমি ক্ষমা চাইতে এসেছি। ছি, ছি, আমি কী খারাপ ব্যবহার করেছি তোমাদের সঙ্গে। তুমি কত যত্ন করে খেতে দিলে, আমি ভেঙে ফেললুম সেই প্লেটটা। তোমরা কি আমায় ক্ষমা করবে ?

বন্দনাদি বললো, বৃষ্টিতে ভিজছো কেন, ওপরে উঠে এসো, জয়দীপ !

জয়দীপ রোহিলা আর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, ওরা···ওরা কি আমায় মারবে ? ওরা নিশ্চয়ই আমাকে খুব খারাপ লোক ভেবেছে ? মাঝে মাঝে আমার মাথার ঠিক থাকে না।

জয়দীপ অনেকক্ষণ থেকেই ভিজছে। তার পোশাক ভিজে শপশপে। বন্দনাদি একটা তোয়ালে এনে নিজেই জয়দীপের মাথা মুছে দিতে লাগলো। দৃশ্যটার মধ্যে এমন একটা সৌন্দর্য আছে যা বুকে এসে ধাক্কা মারে। জয়দীপ বন্দনাদির চেয়ে বয়েসে বেশ বড়ই হবে, কিন্তু এখন তাকে শিশুর মতন লাগে।

বন্দনাদি জিজ্ঞেস করলো, কোথায় মাদল বাজছিল, জয়দীপ ? কী হয়েছে। তুমি কি জানো ?

জয়দীপ বললো, না, জানি না। আমি তো টিলার নিচে কুয়োর ধারে বসেছিলাম। মাথাটা হঠাৎ গরম হয়ে গিয়েছিল কেন কে জানে ? তারপর বৃষ্টি যেই পড়লো, তখন মনে হলো, আমি কী অন্যায় করেছি। এদের সঙ্গে প্রথম দিন

মাত্র আলাপ।

রোহিলা বললো, আমরা কিন্তু খিচুড়ি সব খেয়ে ফেলেছি।

বন্দনাদি বললো, হ্যাঁ, যেমন রাগ করেছিলে, এখন তোমার আধপেটা খেয়ে থাকতে হবে। ঘরের মধ্যে গিয়ে প্যান্ট আর পাঞ্জাবিটাও ছেড়ে ফ্যালো।

জয়দীপ বললো, অ্যাঁ ? এগুলো ছেড়ে কী পরবো ?

—আমার একটা শাড়ীই পরতে হবে। তা ছাড়া উপায় কী ? এগুলো পরে থাকলে তোমার নিউমোনিয়া হয়ে যাবে !

আমি বললুম, আমার কাছে এক্সট্রা পাজামা আছে, দিতে পারি।

জয়দীপ আমার দিকে তাকিয়ে বিহ্বল ভাবে বললো, তুমি···তোমার পাজামা···আমাকে দেবে ?

আমি সেটা বার করে দিলুম। জয়দীপ আমার চেয়ে লম্বা ও চওড়া। পাজামাটি তার আঁট হলো ও পায়ের কাছে অনেকখানি উঠে রইলো। খালি গায়ে সেই ঠেঙো পা-জামা পরে জয়দীপ যখন বেরিয়ে এলো, তাকে দেখে খিল খিল করে হেসে উঠলো রোহিলা।

বন্দনাদি বললো, এ বৃষ্টি তো থামবে না মনে হচ্ছে। তোমরা বাড়ি ফিরবে কী করে ? ফেরার দরকার কী, এখানেই সবাই শুয়ে থাকো। ঘরের মধ্যে গরম হবে, এই বারান্দাতেই তো ভালো।

রোহিলা বললো, আমার খুব বারান্দায় শুতে ইচ্ছে করে। কিন্তু একলা শুতে ভয় করে। আজ কী চমৎকার দিন। আচ্ছা বন্দনাদি, তোমার এক সময় রাত্তিরে ঘুমের আগে মুখে ক্রিম মাখার অভ্যেস ছিল না ? আমার তো খুব ছিল। জঙ্গলে শুটিং করতে যেতাম, তখনও ক্রিম ঠিক সঙ্গে থাকতো। অথচ এখন দিনের পর দিন ক্রিম মাখি না, তাতে কোনোই ক্ষতি হয় না !

বন্দনাদি বললো, ওসব ক্রিম-ট্রিমের কথা আমি ভুলেই গেছি !

আমি বললুম, বন্দনাদি, আমার গলায় সুর নেই তাই, নইলে এখন একটা গান খুব গাইতে ইচ্ছে করছে !

—কোন্ গানটা রে ?

সুরের অভাবে আমি হাত-পা নেড়ে চেঁচিয়ে উঠলুম, এমনি করেই যায় যদি দিন যাক না !

॥ ৮ ॥

সবচেয়ে আগে ঘুমিয়ে পড়লো জয়দীপ। তার একটু একটু নাক ডাকে।

রোহিলা একেবারেই গান গাইতে পারে না, কিন্তু গান ভালোবাসে খুব। আমি ধরিয়ে দেবার পর বন্দনাদি পর পর গান গেয়ে যাচ্ছে, একটা শেষ হতেই রোহিলা বলছে, আর একটা, আর একটা, প্লীজ !

কত গান বন্দনাদির এখনো মুখস্থ আছে। বই-টই কিছু লাগে না। বন্দনাদির গাইবার ধরন অনেকটা ঋতু গুহর মতন, সেই রকম একই সঙ্গে সুরেলা ও জোরালো এবং কথাগুলি স্পষ্ট। নাচ আর গান, দুটোতেই সমান প্রতিভা ছিল বন্দনাদির, কোন্ অভিমানে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার পথ তুচ্ছ করে এখানে চলে এলো, তা জানবার জন্য আমার মনটা ছটফট করে।

রোহিলা একবার উঠে দাঁড়াতেই আমি জিজ্ঞেস করলুম, তুমি নাচবে ? নাচো না, এই গানের সঙ্গে !

রোহিলা ঠোঁট উল্টে বললো, দূর, আমি তো ক্লাসিকাল নাচ একটুও জানি না। ইংরিজি বাজনার সঙ্গে শরীর দোলানো নাচ খানিকটা শিখেছিলুম বটে, কিন্তু তা তো এর সঙ্গে চলবে না।

—বন্দনাদি কিন্তু খুব ভালো নাচতে পারে।

—ওমা, সত্যি ? তা হলে একটু নাচো, বন্দনাদি, একটু নাচ দেখাও !

গান থামিয়ে বন্দনাদি বললো, যাঃ, নাচ আমি একেবারে ভুলে গেছি ! নিয়মিত প্র্যাকটিস না করলে নাচা যায় না।

আমি বন্দনাদির হাত ধরে টেনে বললুম, না, ওঠো, কী রকম ভুলে গেছো, সেটাই দেখি ! সাইকেল চালানো, সাঁতার কাটা এগুলো একবার শিখলে আর কেউ জীবনে ভোলে না। নাচও সেই রকম।

—তুই ছাই জানিস ! নাচ হচ্ছে ফ্রেঞ্চ ভাষার মতন, দু-এক বছর প্র্যাকটিস না করলেই জিভে আর সেই উচ্চারণ আসে না !

আমার মনে পড়লো, বন্দনাদি ফ্রেঞ্চ ভাষাও শিখেছিলেন বটে ! আলিয়াঁস ফ্রাঁসেজে ক্লাস করার সময় স্বরূপ রায় নামে একটি যুবক বন্দনাদিকে বিয়ে করার জন্য একেবারে পাগল হয়ে উঠেছিল। সেই স্বরূপ রায় এখনো আধ-পাগল।

—তুমি ফ্রেঞ্চ ভুলে গেছো ? স্বরূপ রায়ের কথা তোমার মনে আছে ?

—না।

—বন্দনাদি, একটু তবু নাচ দেখাও ! নাচ ছেড়ে দিলে তো শুনেছি সবাই

মোটা হয়ে যায়। কই, তুমি তো মোটা হওনি। নিশ্চয়ই প্র্যাকটিস রেখেছো।

—আমি মোটা হবো কী করে, সারা দিন এখানে খাটাখাটনি করতে হয় না?

রোহিলা এসে বন্দনাদির আর একটা হাত ধরলো, আমরা জোর করে ওকে টেনে দাঁড় করালুম। রোহিলা বললো, একটু না দেখালে তোমাকে ছাড়বোই না।

বন্দনাদি চোখ বুজে প্রথমে একটু চিন্তা করে নিল। দুটো হাত ছড়িয়ে তুড়ি দিতে দিতে তাল ও লয় এলো। তারপর পদক্ষেপ। তারপর উরুর ভঙ্গিমা। তারপর কোমর। তারপর বুক। শরীরটা মোটা না হলেও বন্দনাদির বুক দুটি ভারি হয়েছে মনে হয়। কিংবা, এখানে তো ব্রা পরে না।

একটা পাক দিয়ে ঘুরে যেতেই ঘাঘরাটা ছড়িয়ে প্যারাসুটের মতন হয়ে গেল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে থেমে গিয়ে বন্দনাদি বললো, দেখলি, দেখলি, স্টেপিং কত শ্লো হয়ে গেছে!

দেখেও সে রকম আমি কিছু বুঝিনি। আমার তো মনে হলো, খুব সুন্দর, আগেরই মতন। রোহিলা বললো, চমৎকার, চমৎকার! আর একটু!

বন্দনাদি 'আর না' বলে বসে পড়লো। আর জোর করে লাভ নেই। বেচারি জয়দীপটা দেখতে পেল না!

আমি জিজ্ঞেস করলুম, বন্দনাদি, তুমি সেই যে এলাহাবাদে একটা নাচের টিমের সঙ্গে গেলে...তখনই ঠিক করে নিয়েছিলে যে আর কোনোদিন কলকাতায় ফিরবে না?

বন্দনাদি বললো, গোয়েন্দা নীলুচরণ! দ্যাখো রোহিলা, ও এখন শখের ডিটেকটিভ হয়েছে, আমাদের পেটের কথা সব বার করে নেবে। হ্যাঁরে, নীলু, তোকে যে এত বকি, তাতেও বুঝি তোর শিক্ষা হয় না?

আমি ঠিক একই সুরে বললুম, দ্যাখ্ বন্দনা, তুই আমার কাছে কী লুকোবি? তোর অনেক কথা আমি জানি! এলাহাবাদে একজনের সঙ্গে তোর দেখা হয়েছিল, যে অফিসের কাজের ছুতো করে ওখানে গিয়েছিল, কিন্তু আসলে তোরই সঙ্গে সে নিরালায় দেখা করে...

চুপ! তোর এত সাহস, তুই আমাকে তুই তুই করে কথা বলছিস? আর ঐ সব বস্তাপচা পুরোনো কথা,...এতক্ষণ বেশ সুন্দর মুড হয়েছিল, তুই সব নষ্ট করে দিলি!

রোহিলা বললো, ঠিক বলেছো! এসব কথা কেউ শুনতে চায় না! আর গান হবে না, নাচ হবে না, তাহলে আমি ঘুমোতে যাচ্ছি।

একটুখানি সরে গিয়ে বাইরের দিকে পা করে শুয়ে পড়লো রোহিলা।

বিছানার কোনো বালাই নেই। বন্দনাদির একটি মাত্র বালিশ, সেটা মাথায় দিয়েছে জয়দীপ।

বন্দনাদি বললো, আমারও ঘুম পাচ্ছে। শুয়ে পড়লুম।

বন্দনাদি শুয়ে পড়লো আর একদিকে। ডান কাত হয়ে, মুখের ওপর হাত চাপা দিয়ে।

আমি বসেই রইলুম। চোখে ঘুমের নাম-গন্ধ নেই, শুধু শুধু শুয়ে কী হবে? অন্য যে-কোনো জায়গা হলে এই সময় একটা সিগারেট ধরাতুম। কিন্তু এখানে সাহস হচ্ছে না। এখানে সবাই স্বাধীন, কিন্তু সিগারেটের ওপর নিষেধাজ্ঞাটা বোধহয় স্বাধীনতা-হরণের পর্যায়ে পড়ে না। যেমন কুয়োর জলে বিষ মেশাবার স্বাধীনতা কারুর নেই। মাঝ রাতে একটি মেয়ের গলা টিপে ধরার স্বাধীনতাও কারুকে দেওয়া যায় না।

আজ দ্বিতীয়বার কেন মাদল বাজলো? স্বর্গলোকে সত্যিই দৈত্যের উপদ্রব শুরু হয়েছে? আজ রাতে কি কেউ জ্যোৎস্নার বাড়ির সামনে পাহারা দেবে?

চুপচাপ সময় কেটে যেতে লাগলো। বাইরে কোনো শব্দ নেই। এখানে কোনো কুকুর নেই। এটা একটা আশ্চর্য ব্যাপার। রাস্তায় কুকুরের ডাক শোনা যায় না। এমন জায়গাও রয়েছে ভারতবর্ষে! শুধু শোনা যাচ্ছে ঘুমন্তদের নিঃশ্বাস। জয়দীপের তো অদ্ভুত চরিত্র। এরকম নিশ্চিন্তভাবে কেউ ঘুমোতে পারছে? দু দিকে দুই সুস্বাস্থ্যবতী তরুণী, তার মাঝখানে ঘুমোনো যায়? আমার দ্বারা তো সম্ভব না কিছুতেই। সারা রাত গল্প করা যেতে পারে, কিন্তু পাশাপাশি শুয়ে থাকা...না, আমি শুকদেব নই।

তার থেকে একটু হেঁটে এলে মন্দ হয় না। কিংবা সেই গীর্জাটার মধ্যে একা একা ঘুমোবার চেষ্টা করলে কেমন হয়?

আমি উঠে পড়লুম। বাগানটা পার হবার আগেই বন্দনাদি ডাকলো, এই নীলু, কোথায় যাচ্ছিস? এই নীলু!

আমি কোনো উত্তর না দিয়ে হাত নেড়ে বোঝাবার চেষ্টা করলুম যে চিন্তার কিছু নেই। কিন্তু বন্দনাদি তা বুঝলো না, ধড়মড় করে উঠে প্রায় ছুটে চলে এলো। আমার হাত ধরে বললো, রাগ হয়েছে বুঝি বাবুর? আমাকে ছেড়ে চলে যাওয়া হচ্ছে!

আমি ফিরে দাঁড়িয়ে বললুম, তুমি ঘুমোওনি?

—তুই শুয়ে পড়ছিস না দেখে আমারও ঘুমটা ঠিক আসছিল না!

—বন্দনাদি, আজ তোমাকে ঐ কথাটা ঐরকমভাবে বলা আমার ঠিক হয়নি।

আমার মাথাতেও বোধহয় মাঝে মাঝে পাগলামি চাপে। ভাবলুম, তোমাকে একটা আঘাত দিয়ে তোমার মুখ থেকে কথা বার করবো!

—তোরা সব সময় গল্প মেলাতে চাস, তাই না? কিন্তু সকলের জীবনে কি আর রোমহর্ষক গল্প থাকে? অনেকের জীবন সাদামাটাও হয়। মনের খেয়ালে এমনিই কেউ কেউ বাড়ি ছেড়ে চলে আসে। এর মধ্যে গল্পের কী আছে?

—তোমার জীবন মোটেই সেরকম নয়। তোমার ব্যাপারটা এমনই রোমাঞ্চকর যে প্রায় অবিশ্বাস্য। সবটা জানি না, অনেকটাই রহস্যে ঢাকা, সেইজন্যই কৌতূহল এত বেশি!

—জানতেই হবে, তার কি কোনো মানে আছে? চল, শুয়ে পড়বি চল।

—আমার এখন ঘুম আসছে না। বড্ড গরম লাগছিল। বৃষ্টি তো থেমে গেছে, আমি একটু হেঁটে আসি।

—তুই একা একা যাবি?

—তুমি যাবে আমার সঙ্গে?

—আমি? আমি গেলে তোর ভালো লাগবে? তুই বরং রোহিলাকে ডাক। ওকে নিয়ে বেড়াতে যা। ও মেয়েটা বড্ড প্রেম করতে চাইছিল। এখানে কিন্তু সত্যি ভয়ের কিছু নেই। জ্যোৎস্না নামের মেয়েটির কাল সত্যি কী হয়েছিল, পুরোটা তো জানা হলো না। হয়তো অন্য কোনো ব্যাপার আছে। নইলে, এখানে কেউ গলা টিপে ধরবে, আমার সত্যি বিশ্বাস হয় না! তুই দাঁড়া, আমি রোহিলাকে ডেকে দিচ্ছি!

আমি বন্দনাদির হাত চেপে ধরে কড়া গলায় বললুম, শোনো, আমি কলকাতা থেকে এখানে কোনো মেয়ের সঙ্গে প্রেম করতে আসিনি। কলকাতায় মেয়ের অভাব নেই। আমি এত দূরে আসি, শুধু তোমাকে দেখবার জন্য।

বেশ কয়েক মুহূর্ত অপলক ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো বন্দনাদি। তারপর অস্ফুট ভাবে বললো, তুই আমাকে সত্যিই ভালোবাসিস, নারে নীলু? আমারই বুঝতে ভুল হয়।

একটু থেমে, আমার কাঁধে হাত রেখে আবার বললো, আমি ভেবেছিলুম, রোহিলাকে তোর খুব পছন্দ হয়েছে।

—অপছন্দের কোনো কারণ নেই। কিন্তু সেটা অন্য কথা!

—ঠিক। চল, একটু হাঁটি।

বাগান থেকে বেরিয়ে কিছুটা পথ পার হবার পর আবার থমকে দাঁড়িয়ে বন্দনাদি বললো, এর মধ্যে দু'বারই তুই আমাকে রূপসার খবর এনে দিয়েছিস।

এক হিসেবে তোর জন্যই আমি এখানে থাকতে পারছি। এতদিন রূপসার কোনো খবর না পেলে আমি বোধহয় থাকতে পারতুম না। রূপসাকে দেখবার জন্য ছুটে যেতুম, আর ফেরা হতো না! পরশু রূপসাকে স্বপ্ন দেখলুম, তারপর কাল সারাদিন মনটা খুব খারাপ হয়ে ছিল, আজই তুই এসে পৌঁছে গেলি! কী আশ্চর্য না!

—আমি শুধু রূপসার খবর আনিনি। ওর একটা ছবিও এনেছি।

—অ্যাঁ? ছবি? এখনকার? কই? কোথায় সেই ছবি? এতক্ষণ বলিসনি কেন?

—আমার ঝোলার মধ্যে আছে। ফিরে গিয়ে দেখাবো! ছবিটা কী করে পেলাম জানো? তপেশদার বসবার ঘরের টেবিলে একটা ফ্রেমে বাঁধানো গ্রুপ ছবি ছিল। তপেশদা একবার ভেতরে যেতেই আমি সেটা টপ করে পকেটে ভরে নিয়েছি। পরে ওরা ছবিটা খোঁজাখুঁজি করবে নিশ্চয়ই, কিন্তু আমি সাধারণ একটা ফ্যামিলি গ্রুপ ছবি চুরি করতে পারি, এটা ওরা ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করবে না।

—পাগল ছেলে একটা! তুই আমার জন্য এত সব করতে গেলি? কেন রে?

—তোমাকে ভালোবাসি বলে!

—তুই সেই ছোট বয়েস থেকেই আমায় খুব ভালোবাসিস, আমি জানি, কিন্তু আমারই মনে থাকে না। আমি তোকে বকুনি দিই!

—আকাশের মতন ভালোবাসার রং-ও পাল্টায়! ছোটবেলায় আমি ছিলাম তোমার ভক্ত। তোমার হাসি, তোমার কথা বলা, সব কিছুই ছিল অন্য রকম। বড় হবার পর আমি ঠিক আর ভক্ত থাকিনি, অন্য কিছু, তবে তোমার কাছাকাছি যাইনি। দূর থেকে লক্ষ্য করতুম। তুমি যে হঠাৎ একদিন অদৃশ্য হয়ে যাবে, তা কখনো কল্পনাও করিনি। বন্দনাদি, সেদিন আমি কেঁদেছিলাম, খুব কেঁদেছিলাম, তোমার কাছে এখন স্বীকার করতে লজ্জা নেই। তোমার জন্যই আমি অনেক কষ্টে এই দিকশূন্যপুর খুঁজে বার করেছি!

—নীলু?

বন্দনাদি আর কিছু না বলে আমাকে টেনে বুকে জড়িয়ে ধরলো। আমার চুলে হাত ডুবিয়ে বলতে লাগলো, নীলু, তুই এত ভালো…।

এসবই স্নেহের অভিব্যক্তি। আমার ঠিক পছন্দ হলো না। না চাইতেই আমি জীবনে অনেক স্নেহ পেয়েছি বলেই বোধহয় আমি স্নেহের মর্ম বুঝি না। স্নেহের চেয়েও খানিকটা চড়া ধরনের কিছুর প্রতি আমার আকর্ষণ। আমার নিজের

কোনো দিদি নেই, তাই পৃথিবীর কোনো রমণীকেই আমি দিদি ভাবে দেখি না !

আমি বন্দনাদির আলিঙ্গন মুক্ত হয়ে মাথাটা সরিয়ে নিলাম। তারপর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার কোমরে বাঁ হাত রেখে ডান হাত রাখলুম তার বুকে। এটা আমার প্রতিবাদ।

বন্দনাদি কোনো আপত্তি করলো না, সরে গেল না, স্থির ভাবে তাকিয়ে রইলো আমার দিকে। হু-হু করে পল-অনুপল কেটে যেতে লাগলো। পৃথিবী যে সূর্যের চারদিকে ঘুরছে তা এখন টের পাচ্ছি। অন্তরীক্ষে বেজে চলেছে নিস্তব্ধতার এক বিশ্বসঙ্গীত।

বন্দনাদির বুকে আমি হাত রেখেছি বটে কিন্তু চাপ দিইনি। যেন একটা পায়রার গা। আমার হাত থেমে আছে, কিন্তু আমার শরীর দুলছে।

এক সময় বললুম, বন্দনাদি, তোমায় একটু আদর করবো ? বলতে গিয়ে আমার গলা কেঁপে গেল।

বন্দনাদি তার বুকের ওপর রাখা আমার হাতটা ধরে নিজের গালে ছোঁয়ালো। আস্তে আস্তে বললো, আমায় এইখানে আদর কর, নীলু ! হয়তো আমি তোকে ঠিক বোঝাতে পারবো না।

—আমি বুঝেছি !

বন্দনাদির গালে হাত বুলিয়ে দিতে গিয়ে দেখলুম তার চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। সেই অশ্রু মুছে দিতে দিতে বললুম, আমি তোমায় দুঃখ দিয়েছি ? তুমি এত সুন্দর, তাই তোমাকে না ছুঁয়ে পারা যায় না।

—না, না, দুঃখ নয়। তুই এসেছিস, সে জন্য আমার যে কী অদ্ভুত আনন্দ হচ্ছে, তা ঠিক মুখে বলা যায় না।

ঝট করে আমাকে আবার জড়িয়ে ধরে বন্দনাদি আমার ঠোঁট খুঁজলো। তারপর একটা উষ্ণ, গভীর পরিপূর্ণ চুম্বন দিল।

ফের নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ঝলমলে ভাবে হেসে বললো, এবারে পছন্দ হয়েছে ?

—এর চেয়ে বেশি কিছু পাবার কথা আমি কল্পনাই করিনি !

—দ্যাখ মেঘ কেটে গেছে, সুন্দর জ্যোৎস্না ফুটেছে। ওরা ঘুমোচ্ছে ঘুমোক, আমরা একটু বেড়িয়ে আসি। ঘুম পাচ্ছে না একটুও।

দু'জনে হাতে হাত ধরে, গা ঘেঁষাঘেঁষি করে হাঁটতে লাগলুম। টিলা থেকে খানিকটা নেমে একটা বেশ চওড়া পাথর চোখে পড়লো। এখানে বসলে সামনে একেবারে খোলা উপত্যকা দেখা যায়।

সেই পাথরটার কাছে এসে বন্দনাদি বললো, এখানে আমি প্রায় রাত্তিরেই এসে একা একা বসে থাকি। এখানে এসেই কেন জানি না পুরোনো সব কথা মনে পড়ে। ওপরে, নিজের বাড়িতে কিন্তু অতটা মনে পড়ে না।

—এসো, এখানে একটু বসা যাক। তোমাদের এখানে বেশ মজা আছে, রাত জাগলেও ক্ষতি নেই, পরের দিন তো কাজে যেতে হবে না।

—আসলে খুব বেশি ঘুমের দরকার হয় না। সারা দিনে-রাতে ভাগ ভাগ করে পাঁচ ছ'ঘন্টা ঘুমিয়ে নিলেই হয়। তুই এখানে কিছুদিন থাকলে বুঝতে পারবি, মানুষের প্রয়োজন কত কম। সিগারেট, মদ, পারফিউম, লিপস্টিক, সাবান, টুথপেস্ট এসব কোনোটারই দরকার হয় না। তাতেও অনেক আনন্দ পাওয়া যায়।

—তা জানি। কিন্তু একবার এসবে অভ্যেস হয়ে গেলে ছাড়তে পারাটা যে খুব কঠিন !

—সবচেয়ে পুরোনো অভ্যেস হচ্ছে নিজের বাড়ি। সেটা যে ছাড়তে পারে, তার পক্ষে অন্য কিছুই ছাড়া কঠিন নয়।

—একটা কথা জিজ্ঞেস করবো, বন্দনাদি ? শরীরের কিছু কিছু দাবি থাকে, তাও কি তোমরা বাদ দিয়েছো ?

—না, না, তা বাদ দেবো কেন ? যার যা ইচ্ছে হবে, তা বাদ দেবার তো কোনো প্রশ্নই নেই। আমার ব্যাপারটা তোকে বলি, যে-কোনো কারুর সঙ্গে শারীরিক মিলন, আমার একদম পছন্দ হয় না। ও জিনিসটাকে আমি পবিত্র মনে করি, সত্যিকারের কারুর সঙ্গে মনের মিল হলেই তবে ওটা ভালো লাগে। তা বলে আমার কোনো শুচিবাই নেই। কেউ আমার গায়ে একটু হাত রাখলেই আমার গা ক্ষয়ে যায় না। কারুর কারুর এ রকম থাকে। এই জয়দীপের কথাই ধর না। ওর আগেকার জীবনে কী ছিল, আমি জানি না, কিন্তু ও মেয়েদের স্পর্শ সহ্য করতে পারে না। আমি একদিন এমনিই হালকা ভাবে ওকে একটু চুমু খেতে গিয়েছিলাম, ও মাথা সরিয়ে নিয়ে বলেছিল, না, না, না, না !

—আমি ভুল ভেবেছিলাম। আমার ধারণা হয়েছিল, জয়দীপ তোমার প্রেমিক !

—জয়দীপকে আমি প্রেমিক হিসেবে চিন্তাই করতে পারি না। তবে আমি বন্ধু হিসেবে ওকে সাহায্য করতে চাই।

—অতবড় চেহারার মানুষটা, কিন্তু খুব অসহায় মনে হয়।

—এখানে এসে অনেককে দেখছি তো ? প্রথম প্রথম যাদের খুব অস্বাভাবিক

মনে হয়, যাদের মন খুবই অস্থির কিংবা অসুস্থ, তারাও আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে আসে। এই জায়গাটার একটা গুণ আছে ঠিকই। মানুষের উন্নতি আর অবনতির মূল কারণ কিন্তু একটাই। প্রতিযোগিতা! এই প্রতিযোগিতায় দু'একজনই তো মাত্র জেতে। আর যারা হেরে যায়? তাদের সংখ্যাই তো বেশি, তারা সবাই ওটা ঠিক মেনে নিতে পারে না। তাদের কারুর কারুর কেন্দ্র নড়ে যায়। আমাদের এখানে কোনো প্রতিযোগিতা নেই। তাই আমরা সবাই সুখী।

—প্রতিযোগিতার বদলে এখানে সহযোগিতা।

—ঠিক তাই। আচ্ছা নীলু, তুই যে তখন বললি, এলাহাবাদে আমার সঙ্গে একজনের দেখা হয়েছিল, সে অফিসের কাজের ছুতো করে এসেছিল, সে কে তা তুই জানিস?

—হ্যাঁ জানি। দীপক নামে আমার এক বন্ধু বলেছে, সে তোমাদের দু'জনকেই এলাহাবাদে দেখেছিল।

—আমি যেখানে যেখানে মিউজিক কনফারেন্সে যেতাম, সেখানেই সে যেত, তাও কি তুই জানিস?

—আন্দাজ করতে পারি।

—তোকে আমি এখন যা বলবো, তুই পৃথিবীর আর কারুকে তা বলবি না, বল?

—আমি কী প্রতিজ্ঞা করবো বলো? তোমার পা ছুঁয়ে?

—না, অত ভক্তির দরকার নেই। আমার হাত ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা কর।

আমি বন্দনাদির দুটি হাত তুলে এনে আমার ঠোঁটে ছোঁয়ালুম। তারপর বললুম, গোপনীয়তা একটা বিরাট কঠিন বোঝা, সারা জীবন একা একা বহন করা যায় না।

বন্দনাদি সামনের অন্ধকারের দিকে চেয়ে যেন ছায়াছবি দেখছে এইভাবে বললো, তোরা জানিস, আমার অনেক বন্ধু ছিল, আমি খোলামেলাভাবে মিশতাম। ফাস্ট লাইফের দিকে আমার ঝোঁক ছিল, গাড়ি করে হঠাৎ ডায়মণ্ডহারবার যাওয়া কিংবা কোনো ফাংশান শেষ হবার পর সারারাত এয়ারপোর্ট হোটেলে···অনেকে ভাবতো আমি বুঝি ছেলেদের সঙ্গে যা-খুশী তাই-ই করি।

—না, তা ভাবতো না কেউ। বরং সবার ধারণা ছিল, তুমি সহজভাবে মিশলেও কিছুতেই ধরা দিতে চাও না।

—তুই কী করে জানলি?

—আমি তো তোমার প্রেমিক ছিলাম না, কিন্তু আমি তোমাকে ভালোবাসতাম। এই ভালোবাসার তুমি যে নামই দাও! আমি দূর থেকে সব সময় লক্ষ করতাম তোমাকে।

—আমি যখন বাইরে যেতাম, তখন তুই দেখতে পেতিস না আমাকে।

—তা পেতাম না অবশ্য। স্বরূপ রায় তোমার সঙ্গে বাইরেও যাবার চেষ্টা করতো অবশ্য।

—না, না, স্বরূপ কেউ নয়, ও তো একটা পাগল। একবার বেঙ্গালোরে একটা অনুষ্ঠান করার সময় দেখি, দর্শকদের মধ্যে থার্ড রো-তে একজন বসে আছে। আমার খুব চেনা। তিনি অফিসের কাজে ওখানে গিয়েছিলেন, হঠাৎ আমার অনুষ্ঠানের খবর পেয়ে দেখতে এসেছিলেন। আমি চমকে গেছিলাম, খুব ভালোও লেগেছিল।

—তপেশদা!

—তুই জানিস! বলিস না, প্লীজ, লক্ষ্মীটি, কারুকে বলিস না।

—না, বলবো না। তারপর?

—তপেশদা সব সময় ভালো হোটেলে ওঠে। আমাকে ডেকে নিয়ে ডিনার খাওয়ালেন। পরের মাসে একটা অনুষ্ঠান ছিল জামশেদপুরে। সেখানেও দেখলুম তপেশদাকে। জোর দিয়ে বললেন, সেখানেও অফিসের কাজেই এসেছে। কিন্তু শান্তিনিকেতনে ওর অফিসের কী কাজ থাকতে পারে? সেখানে তপেশদাকে দেখে জিজ্ঞেস করেছিলুম, একী? তপেশদা বললো, আমার আসল কাজ ছিল দুর্গাপুরে, তোমার অনুষ্ঠানের একটা পোস্টার দেখে এই পর্যন্ত চলে এলাম। তোমার প্রত্যেকটা অনুষ্ঠানই আমার দেখতে ইচ্ছে করে।

—অপর্ণাদিকে উনি জানিয়েছিলেন কী?

—তখন আমি বাবা-মায়ের সঙ্গে থাকি। দিদির বাড়িতে তো আর রোজ যাই না। প্রথমবার বেঙ্গালোরে যে তপেশদার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, সে কথা আমি নিজেই দিদিকে বলেছি। পরেরগুলো তপেশদা জানিয়েছিলেন কি না, তা তো আমি জানি না। তপেশদার সেলস-এর চাকরি, নানান জায়গায় যেতেই হয়। আমার জামাইবাবু আমার অনুষ্ঠান সম্পর্কে এত আগ্রহী তা জেনে আমার ভালো লাগবে না? তখন তো আমি মশগুল হয়ে ছিলাম। তপেশদা চমৎকার মানুষ, হৈ চৈ ভালোবাসেন, ওঁর চেনাশুনোর সংখ্যা অনেক, অচেনা জায়গায় ফাংশান করতে গেলে উনি অনেক হোমরা-চোমরা লোকদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতেন। তপেশদার উৎসাহেই আমার প্রথম রেকর্ড বেরোয়। বাইরের শহরে

তপেশদা আমাকে হোটেলে নিয়ে খাওয়াতেন, তখন আমি ড্রিংক করতাম, সিগারেট খেতাম, তুই তো জানিস, তপেশদা আদর করে আমায় জড়িয়ে ধরতেন, গালে চুমু খেতেন, জামাইবাবু এরকম করতেই পারে। একদিন আমাদের দু'জনেরই একটু নেশা হয়ে গিয়েছিল, তপেশদা আমাকে বিছানায় শুইয়ে দিলেন, তারপর আদর করতে করতে—ঐ ব্যাপারটা হয়ে গেল।

—সেই জায়গাটা কোথায় ?

—হ্যাঁ, জায়গাটা ইম্পর্ট্যান্ট। সেবারে ফাংশান করতে গিয়েছিলাম শিলং-এ। ফাংশন খুব ভালোভাবে হয়ে গেল, তপেশদা আমাকে নিয়ে বেড়ালেন খানিকক্ষণ, রেস কোর্সের দিকে গিয়েছিলাম, কী চমৎকার লাগছিল, শীত ছিল না বেশি, হাওয়া দিচ্ছিল, তারপর বৃষ্টি নামলো, আমরা হোটেলে চলে এলাম। ব্র্যাণ্ডিতে চুমুক দিতে দিতে জানলা দিয়ে বৃষ্টি দেখা...

দৃশ্যটা ভেসে উঠলো আমার চোখের সামনে। নাচের অনুষ্ঠান থাকলে বন্দনাদি দারুণ সাজগোজ করতো। অনুষ্ঠান ভালো হয়েছে, তাই মনটা খুশীর চাঞ্চল্যে ভরা, তারপর তপেশদার সঙ্গে বেড়ানো, পটভূমিকায় শিলং-এর বিখ্যাত সৌন্দর্য, হোটেলে এসে ব্র্যাণ্ডি পান...এই রকম একটা সন্ধের জন্যই জীবনটা বদলে যেতে পারে।

বন্দনাদি বললো, প্রথমে আমি ঘটনাটাকে গুরুত্ব দিইনি খুব বেশি। সকালে উঠে কান্নাকাটি করেছিলুম বটে কিন্তু এটাও বুঝেছিলুম, আগে থেকে ঠিকঠাক করে তো কিছু হয়নি। এমনিই এক রাত্রির মাদকতা ! ছোড়দিকে আমি খুবই ভালোবাসি, ছোড়দি জানতে পারলে দুঃখ পাবে, তপেশদার ওপরেই বেশি রাগ করবে, তাই ঠিক করলুম, একেবারে কিছু না বলাই ভালো। কিন্তু তপেশদাই পাপ বোধে ভুগতে লাগলো। ওর ধারণা হলো, আমার খুব ক্ষতি করে দিয়েছে, সেটা শোধরাবার দায়িত্বও ওর। যখন বোঝা গেল যে আমি প্রেগন্যান্ট, তখন তপেশদা বললো, আমাকে বিলেতে পাঠিয়ে দেবে, সেখান থেকে কিউরেট করে ... । তাতেই আমার জেদ চেপে গেল। আমি কি নিজের দায়িত্ব নিতে পারি না ? যা হয়ে গেছে, তাতে আমারও তো সমান দায়িত্ব ছিল ! আমি জীবনে একটা পিঁপড়ে পর্যন্ত মারিনি, আর একটা মনুষ্যপ্রাণ, আমার প্রথম সন্তান, তাকে মেরে ফেলবো ? কোনো আর্টিস্ট তা পারে ?

—তুমি তো বিলেতেই গিয়েছিলে ?

—বিলেতে নয়, ক্যানাডায়। সেখানে তপেশদা পাঠাননি, আমি নিজেই একটা কোর্স করতে গিয়েছিলাম। এক বছর বাদে আমি রূপসাকে কোলে নিয়ে

ফিরলে, সবচেয়ে বেশি চমকে গিয়েছিল তপেশদা। সবাই ভাবলো, ক্যানাডায় আমার বিয়ে হয়েছে, সেখানে আমার স্বামী আছে। আমি মিথ্যে কথা বলি না, আমি জানিয়েছিলুম যে ক্যানাডায় আমার স্বামী নেই। তখন সবাই ভাবলো, ওখানে আমার বিয়ের পরেই ডিভোর্স হয়ে গেছে।

—তুমি ক্যানাডা থেকে ফিরে এলে কেন ?

—কারণ কলকাতাই ছিল আমার নিজস্ব জায়গা। আমার নাচ ও গানের জগৎ তো কলকাতাকে ঘিরেই। ক্যানাডায় থেকে কী করবো !

—তখন তুমি বাবা-মায়ের কাছ থেকে চলে এসে পার্ক সার্কাসে আলাদা ফ্ল্যাট নিয়ে থাকতে। তখনও তোমার অনেক অ্যাডমায়ারার ছিল। আচ্ছা বন্দনাদি, তুমি তো তারপরেও কারুকে বিয়ে করতে পারতে। আজকাল ডিভোর্সি মেয়েদের, একটি-দুটি বাচ্চা সমেত তো বিয়ে হয় দেখেছি।

—সেটা ভেবে দেখা যেত। বিয়ে না করলেই বা ক্ষতি কী ছিল ? তখন আমি নিজে রোজগার করছিলাম, ভেবেছিলাম রূপসা একটু বড় হলে ওকে হস্টেলে পাঠিয়ে আমি গান-বাজনা নিয়েই থাকবো। ঐসবের দিকেই তো খুব ঝোঁক ছিল। কিন্তু, সব গণ্ডগোল করে দিল তপেশদা। ওঃ, কী কষ্ট যে পেয়েছি তখন, তুই বুঝবি না, কেউ বুঝবে না। রূপসার যখন আড়াই বছর বয়েস, তখন আমি আবার একটা ফাংশান করতে গেলাম পাটনায়। মাঝখানে অনেক দিন যাইনি। সেই পাটনাতেও গিয়ে দেখি সেখানে তপেশদা উপস্থিত। আমার রাগও হলো, দুঃখও হলো। আমি বললুম, তুমি এ কী করছো, তপেশদা ! আগে যা হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে, কিন্তু এখন তুমি এরকম বাড়াবাড়ি করলে সব জানাজানি হয়ে যাবে ! তপেশদা কিছুতেই শুনবে না। তার তখন ঠিক পাগলের মতন অবস্থা। নেশাও করছে খুব। আমার তখন কী করার ছিল বল তো ? আমি কি আমার নিজের ছোড়দির সংসার ভাঙবো ? ছোড়দির সঙ্গে আমার খুব ভালো সম্পর্ক ছিল, কোনোদিন ঝগড়া হয় নি ! আমি সেই ছোড়দির সর্বনাশ করতে পারি ? তাছাড়া, তপেশদার সঙ্গে আবার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসার বিন্দুমাত্র ইচ্ছেও আমার মনে জাগে নি। আর এটা এমনই ব্যাপার যে অন্য কারুর কাছে সাহায্যও চাওয়া যায় না। তপেশদা আমার বারণ শুনলো না, বাইরের সব ফাংশানে আসতে লাগলো। তখন আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হলো। এলাহাবাদে যাবার সময়েই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে গিয়েছিলুম, সেখানেও যদি তপেশদাকে দেখি, তাহলে আমি আর ফিরবো না। আমার মেয়ে ছোড়দির কাছে ভালোই থাকবে। ছোড়দি তাকে নিজের মেয়ের মতনই দেখবে, তপেশদাও অযত্ন করতে পারবে

না। আমার যা হয় তা হবে!

—এলাহাবাদ থেকে তুমি অদৃশ্য হয়ে গেলে। তারপর এখানে কী করে এলে? এই জায়গাটার কথা তুমি আগে জানতে?

—না, জানতুম না। অনেক ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে পৌঁছেছি। এই জায়গাটায় তো সহজে আসা যায় না, দিকশূন্যপুরকে আবিষ্কার করতে হয়। তবে এখানে যারা আসে, তারা অনেক দুঃখে পুড়ে খাঁটি হয়ে আসে।

—এখানে এলে সবারই পিছুটান চলে যায়?

—সবার যায় কি না জানি না। কেউ কেউ তো ফিরেও যায় দেখেছি। কিন্তু আমার আর একটুও পিছুটান নেই। লোকে আমাকে ভালো বলবে, নাচ-গানের জন্য খ্যাতি হবে, এই মোহটা যে একদম চলে গেছে। এখন একলা জঙ্গলের গাছপালাকে গান গেয়ে শোনাই, তাতেও ভালো লাগে।

—কিন্তু রূপসা, রূপসার জন্য টান নেই!

—ও হ্যাঁ, তোকে ভুল বলেছি, ঐ একটা পিছুটান এখনো আমার রয়ে গেছে। এক এক সময় বুক টনটন করে, মনে হয় ছুটে যাই। রাত্তিরে ঘুম ভেঙে উঠে বসি, ফাঁকা বুকটার কাছে দু'হাত এনে ওকে আদর করি। রূপসা হয়তো একদিন আমাকে ভুলে যাবে, কিন্তু আমি যে ওকে কিছুতেই ভুলতে পারবো না!

একটু থেমে বন্দনাদি আবার বললো, তপেশদার ওপর এখন আমার একটুও রাগ নেই। তপেশদার জন্যই তো আমি শেষ পর্যন্ত এখানে এসে পৌঁছেছি, আগেকার জীবনের চেয়ে এখানে অনেক বেশি সুখে আছি।

—হয়তো তপেশদা এখনো কষ্ট পাচ্ছে। বাইরে থেকে দেখলে বোঝা যায় না, নিজেকে আজকাল সব সময় কাজেকর্মে ব্যস্ত রাখেন, কিন্তু ভেতরে ভেতরে কষ্ট আছে নিশ্চয়ই।

—অনেক মানুষ কষ্ট পাবার জন্য কষ্ট তৈরি করে। এখানে ওসব বালাই নেই। কেউ অকারণে নিজেও কষ্ট পায় না, অন্যকেও কষ্ট দেয় না!

—তা হলে জ্যোৎস্নার ব্যাপারটা?

—ওটা শুনে আমি সত্যিই আশ্চর্য হয়েছি। ভালো করে জানতে হবে!

ঠিক এ সময় একটা আর্তস্বর শুনতে পেলাম। নারী কণ্ঠ, বন্দনাদির বাড়ি থেকে। ওখানে জয়দীপ আর রোহিলা শুয়ে আছে।

শব্দটা একবার হয়েই থেমে গেল। বন্দনাদি তাকালো আমার চোখের দিকে। তারপর কেউ কিছু না বলে দ্রুত পা চালালুম।

ওপরে এসে দেখলুম, জয়দীপ তখনও শুয়ে আছে পাশ ফিরে, একটু দূরে

বসে আছে রোহিলা, দু'হাতে মুখ ঢাকা।

আমরা কাছে যেতেই রোহিলা বললো, তোমরা কোথায় চলে গিয়েছিলে? আমার ভয় করছিল খুব। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল...

আমি জয়দীপের দিকে তাকাতেই রোহিলা আবার বললো, ও কী ঘুম ঘুমোতে পারে, আমি ডাকলুম, তাও উঠলো না!

বন্দনাদি জিজ্ঞেস করলো, তুমি চেঁচিয়ে উঠলে কেন?

—একটা খুব খারাপ স্বপ্ন দেখলুম। একটা মস্ত বড় দাঁড়িপাল্লা, তার একদিকে আমাকে বসানো হয়েছে, আমার গায়ে কোনো জামা-কাপড় নেই, আর অন্যদিকে অনেক টাকা আর শিশি-বোতল। কয়েকজন লোক মিলে আমাকে ওজন করে বিক্রি করে দিচ্ছে। লোকগুলোকে আমি চিনি। ওরা আমাকে আগেও কয়েকবার বিক্রি করে দিয়েছে। কেন এই স্বপ্নটা দেখলুম? বন্দনাদি, ওরা আবার এখানে আসবে না তো? আমাকে ধরে নিয়ে যাবে না তো?

রোহিলার মুখে সত্যিকারের ব্যাকুলতা দেখে বন্দনাদি এগিয়ে গিয়ে ওর মাথায় হাত রেখে বললো, যাঃ, পাগল! এখানে ওরা কেউ আসবে না। ঐসব খারাপ লোক দিকশূন্যপুরের সন্ধান কোনোদিনই পাবে না!

॥ ৯ ॥

আমি ঘড়ি পরি না, এখানে কেউই ঘড়ি ব্যবহার করে না, আকাশের ঘড়িই ভরসা। সকালের রোদ দেখে মনে হলো নটা-সাড়ে নটা বাজে। আলু সেদ্ধ আর ডিম সেদ্ধ দিয়ে বেশ ভরাট ব্রেকফাস্ট হলো, সঙ্গে দু' কাপ করে চা। বন্দনাদি বললো, শোনো, তোমরা যে আমার সব খাবার খেয়ে নিচ্ছো, তার জন্য তোমাদের কিন্তু দু'দিন আমার বাগানে কাজ করে দিয়ে যেতে হবে। চা-টা অবশ্য নীলু এনেছে!

জয়দীপ বললো, আমি তোমার বাগানের মাটি কুপিয়ে দেবো!

রোহিলা বললো, আমি জল এনে দেবো নিচ থেকে?

আমি বললুম, আজকের দিনটা ছুটি নিলে হয় না? আমি তো আর এখানে রোজ রোজ থাকছি না।

চোখে এখনো ঘুমের আবেশ লেগে আছে। আড্ডা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করছে না। চা জিনিসটাকে এত প্রিয় আগে কখনো মনে হয়নি। বৃষ্টি উধাও হয়ে গেছে,

আজ আকাশে রোদ বেশ চড়া।

পুরোনো অভ্যেসে আমি বলে ফেললুম, এখন কটা বাজে?

সবাই হেসে উঠলো, বন্দনাদি বললো, কেন, তোর অফিস যাবার তাড়া আছে নাকি? তুই তো বেকার!

ঘড়ির প্রসঙ্গ উঠতে জয়দীপ জানালো যে এখানে আসবার সময় তার হাতে একটা ঘড়ি ছিল। সেটা কোয়ার্টজ ঘড়ি, দম দিতে হয় না। এখানে কোনো ঘড়ির পাট নেই দেখে সেটা সে নদীর ধারে বালিতে পুঁতে রেখেছে।

বন্দনাদি বললো, কোথায় রেখেছো মনে আছে? তাহলে নীলুকে দিয়ে দিতে পারো। শুধু শুধু নষ্ট করে কী হবে?

জয়দীপ বললো, কী জানি, ঠিক জায়গাটা খুঁজে পাবো কি না!

আমি বললুম, যাক ভালোই হয়েছে। ঘড়ি আমার সহ্য হয় না। ঘড়ি পরলেই আমার মাথা ধরে।

বন্দনাদি বললো, অনেকের কিন্তু পুরোনো অভ্যেস রয়ে যায়। আমি দেখেছি, এখানে কেউ কেউ কথা বলবার সময় বাঁ হাতটা ঘুরিয়ে দেখে নেয়। তারপর আকাশের দিকে তাকায়।

রোহিলা বললো, আমার তো এক সময় ঘড়ি ছিল একটা গয়না। ঘুমের মধ্যেও ঘড়ি হাতে থাকতো।

জয়দীপ বললো, আমি তো এক একদিন সুইমিংপুলে নামার সময়ও ঘড়ি খুলতে ভুলে যেতাম!

রোহিলা যেন হঠাৎ কিছু আবিষ্কার করার মতন চেঁচিয়ে বললো, এই!

তারপর চোখ বড় বড় করে আমাদের তিনজনের দিকে তাকিয়ে বললো, কাল রাত্রে আমাদের নদীর ধারে ঘুমোনো হয়নি। আজ এখন সবাই মিলে নদীতে স্নান করতে গেলে কেমন হয়?

জয়দীপ বললো, ভালো আইডিয়া! সাঁতার কাটতে আমার খুব ভালো লাগে!

আমি বন্দনাদির মুখের দিকে তাকালাম। বন্দনাদি খানিকটা অনিচ্ছার সঙ্গে বললো, আমার বাগানে অনেক কাজ পড়ে আছে···রাত্তিরে গেলে হয় না? রাত্তিরবেলা, একটু একটু জ্যোৎস্নার আলো, তখন আরও ভালো লাগবে!

এক একটা কথা হঠাৎ হঠাৎ ছবি হয়ে যায়। আমি এক পলকের জন্য দেখতে পেলাম রাত্তিরবেলা নদীর জলে কয়েকজন নারী-পুরুষের স্নানের দৃশ্য। হ্যাঁ, দিনের বেলার ছবির চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর।

রোহিলা বললো, অতক্ষণ ধৈর্য ধরে থাকতে পারবো না। চলো, এক্ষুনি চলো! বন্দনাদি, প্লিজ চলো!

—তোমাদের জামা-কাপড় আনতে যেতে হবে তো তাহলে? জলে নামবে কী পরে?

—আমি তো জামা-কাপড় খুলেই—

বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল রোহিলা। লজ্জা পেয়ে বললো, না, তা বোধহয় চলবে না! তাহলে কী করবে বলো!

—তুমি তিন বছরের বাচ্চা মেয়ে, তুমি কিছু না পরেই জলে নামতে পারো। কিন্তু আমরা তো তা পারবো না!

জয়দীপ বললো, চলো, চলো, বন্দনা। একটা-দুটো তোয়ালে নিয়ে চলো, তাতেই হয়ে যাবে!

বন্দনাদি ঘরে গিয়ে একটা পুঁটুলি তৈরি করে নিয়ে এলো। তারপর শুরু হলো স্নান-যাত্রা।

মধ্য-যামিনীতে যে-পাথরের বেদীটার ওপরে বসেছিলাম, সেটার কাছে আসতেই বন্দনাদি তীক্ষ্ণ চোখে তাকালো আমার দিকে। আমি হাসলুম। বন্দনাদির গোপন কথা আমি বুকের অনেক ভেতরের সিন্দুকে বন্ধ করে রেখেছি।

একপাল ছাগলছানা নিয়ে ওপরের দিকে উঠে আসছেন এক ভদ্রলোক। একটু কাছে আসতেই চিনতে পারলুম, এঁকেই কাল বন্দনাদি প্রভাসদা বলে ডেকেছিল। ভদ্রলোকের চেহারা তবলচির মতন, ছাগল-পালকের ভূমিকায় তাঁকে অদ্ভুত দেখাচ্ছে।

ভদ্রলোক চেঁচিয়ে বললেন, বন্দনা, দলবল নিয়ে কোথায় চললে? আমি তোমার কাছেই আসছিলুম!

বন্দনাদি বললো, আপনার সঙ্গেও তো দলবল কম নেই দেখছি! আমরা নদীতে স্নান করতে যাচ্ছি।

ভদ্রলোক বললেন, তাহলে আমিও তো গেলে পারি। কিন্তু এদের নিয়ে কী করি? এদের ছেড়ে দিলেই তোমার বাড়ির দিকে চলে আসে।

—তাই নাকি? ওরা আমাকে ভালোবেসে ফেলেছে!

—ছাগল তো পাহাড়ী জীব, ওরা সব সময় উঁচুতে উঠে বসে থাকতে ভালোবাসে! ওদের মালিক যে তোমাকে ভালোবাসে, সেটাও ওরা বুঝে ফেলেছে!

বন্দনাদি খপ করে একটাকে ধরে কোলে তুলে নিল। ছাগলছানার সঙ্গে হরিণছানার বিশেষ কোনো তফাৎ নেই, রংটা ছাড়া। মুখখানাতে যেন মানবশিশুর চেয়েও বেশি লাবণ্য। বন্দনাদির বুকে সেটা ছটফট করে।

বন্দনাদি জিজ্ঞেস করলো, প্রভাসদা, কাল রাত্তিরে দ্বিতীয়বার মাদল বেজেছিল কেন?

—সেকথা তো আমি তোমাকেই জিজ্ঞেস করতে আসছি। তোমাদের এদিকেই বেজেছিল না?

—না তো! আমার বাড়ি থেকে অনেক দূরে!

—আমার বাড়ি থেকেও তো অনেক দূরে মনে হলো, তাই আমি যাইনি!

ছাগল ছানাটাকে কোল থেকে নামিয়ে বন্দনাদি ছদ্মকোপে বললো, প্রভাসদা! আপনার মনে হয়েছিল বাজনাটা আমার বাড়ির দিকে। তাও আপনি ছুটে আসেননি কেন? এই আমার প্রতি আপনার ভালোবাসা!

এ কথার উত্তর দিলেন না প্রভাসদা। ছাগলছানাগুলো ইতস্তত ছড়িয়ে যাচ্ছিল, তিনি তাদের সামলাবার জন্য ছড়ি তুলে এই হ্যাট হ্যাট বলে ছুটে গেলেন এবং ধুতির খুঁটে পা জড়িয়ে আছাড় খেলেন প্রকাণ্ড।

আমরা হাসি চাপতে পারলুম না। প্রভাসদা আগের জীবনে তবলচি ছিলেন কিংবা ইংরিজির অধ্যাপক ছিলেন তা জানি না, কিন্তু এখানে ছাগল-চরানোর ভূমিকাটা তিনি এখনো রপ্ত করতে পারেননি।

জয়দীপ এবং বন্দনাদি ছুটে গিয়ে ওঁকে টেনে তুললো।

প্রভাসদা উঠে বসে বন্দনাদির দিকে চেয়ে বললেন, আমি জানতুম, কাল তুমি কোনো বিপদে পড়লেও তোমাকে সাহায্য করার অনেক লোক আছে।

বন্দনাদি বললো, প্রভাসদা, তুমি তোমার পোষ্যদের কী ব্যবস্থা করবে করো। তারপর এসো। আমরা নদীর দিকে এগোচ্ছি।

টিলার নিচে নেমে আমি জিজ্ঞেস করলুম, বন্দনাদি, তোমার অঙ্কের মাস্টার প্রেমিকটিকেও ডেকে নেবে নাকি?

—ডাকবো? ওকে কেউ ডাকে না। আমরা ডাকলে খুব খুশী হবে!

—হ্যাঁ, ডাকো না। মোর দা মেরিয়ার!

—না থাক। বুড়ো মানুষ, নদীতে স্নান করলে যদি অসুখ-বিসুখ বেধে যায়!

বৃদ্ধকে দেখা গেল নিজের বাড়ির উঠোনে একটা চেয়ারে বসে আছেন। হাতে একটি খোলা বই।

—বই? এখানে বই থাকে বুঝি?

বন্দনাদি বললো, কেন থাকবে না? বই ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে নাকি? এখানে অনেকেই তো মাঝে মাঝে শহরে লোক পাঠিয়ে বই আনায়।

—তোমার বাড়িতে কোনো বই দেখিনি। তোমার দরকার থাকলে আমি নিয়ে আসতে পারতুম।

—না, আমি এখন বই পড়ি না। বই আমাকে বড় উতলা করে দেয়।

কুয়োর ধারে দু'বালতি জল কেউ তুলে রেখে গেছে। কয়েকটা পেয়ারা আর দুটো ভুট্টাও রেখে গেছে কেউ। ঐ বৃদ্ধের জন্যই নিশ্চিত।

আমি রোহিলাকে বললুম, জানো তো, ঐ বুড়ো লোকটি বন্দনাদিকে বিয়ে করার জন্য ঝুলোঝুলি করে।

রোহিলা হি হি করে হেসে উঠে বললো, তাহলে বেশ মজা হতো! এখানে সত্যি সত্যি কারুর সঙ্গে কারুর বিয়ে হয়?

বন্দনাদি বললো, জয়দীপ, তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে দেবদত্ত আর সহেলীর কথা? দু'জনের চরিত্রে কোনো মিল নেই, বুঝলি। সহেলী নাকি একবার আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল, তারপর বেঁচে গেছে বলে জীবনটাকে পূর্ণমাত্রায়, প্রতি মিনিট ইচ্ছে মতন ভোগ করতে চায়। দারুণ ছটফটে আর খেয়ালী। অনেকে তো ওকে সহেলীর বদলে খেয়ালী বলেই ডাকতো! আর দেবদত্ত ছিল দারুণ গম্ভীর আর মন-মরা ধরনের, যেন সব সময় কোনো অপরাধ বোধে ভুগছে। কারুর সঙ্গে মিশতে চাইতো না, ওর এখানে কোনো বন্ধু ছিল না, আমাদের সন্দেহ ছিল ও রোজ ঠিক মতন খায় কি না? এই দেবদত্ত আর সহেলীর যে কী করে আলাপ-পরিচয় হলো, মনের মিল হলো, তা আমরা কেউই জানি না!

জয়দীপ বললো, কেউ কেউ বলে, জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে এক সঙ্গে একটি মৃতদেহ দেখার পর ওদের প্রেম হয়। ওরা দু'জনে মৃত মানুষটির দু'পাশে দাঁড়িয়ে পরস্পরকে প্রথম ভালো করে দেখে।

বন্দনাদি বললো, কী জানি! কিন্তু সেই যে ওদের প্রেম হলো, তারপর কী প্রেম কী প্রেম! তুই লাভ বার্ডস দেখেছিস, নীলু? সবুজ রঙের পাখি, টুনটুনির থেকে খানিকটা বড়, সব সময় জোড়ায় জাড়ায় থাকে, কখনো একটাকে আলাদা দেখা যায় না, ওরাও ঠিক সেই রকম। সহেলীকে দেখলেই এদিক ওদিক তাকাতাম আমরা, দেবদত্তকে কাছাকাছি দেখতে পাওয়া যাবেই। তারপর ওরা একদিন মিটিং-এ জানালো যে ওরা বিয়ে করতে চায়, তাতে আমাদের কোনো আপত্তি আছে কি না। এখানে কারুর আপত্তি থাকার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

প্রভাসদা বলেছিলেন, ফর্মাল বিয়ে করারও দরকার নেই, ওরা একসঙ্গে এক বাড়িতে থাকতে পারে অনায়াসে। কিন্তু ওরা তাতে রাজি নয়, ওরা চাইলো যে সবার সামনে ঘোষণা করে পরস্পরকে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে বরণ করতে। আমরা বললুম, ঠিক আছে, সামনের পূর্ণিমা রাতে আমরা সবাই মিলে গান গেয়ে, কবিতা পাঠ করে ওদের স্বামী-স্ত্রী হিসেবে বরণ করবো। কিন্তু সেটাও বোধহয় ওদের পছন্দ হয়নি। ওরা চেয়েছিল আনুষ্ঠানিক বিয়ে। একদিন কারুকে কিছু না জানিয়ে ওরা এখান থেকে চলে গেল। আশা করি ওরা সুখে আছে!

জয়দীপ বললো, ওদের দু'জনের মধ্যে অন্তত একজন যদি আবার এখানে খুব শিগগিরই ফিরে আসে, আমি তাতে আশ্চর্য হবো না!

বন্দনাদি জিজ্ঞেস করলো, কেন, একথা বলছো কেন, জয়দীপ?

—কেন যেন আমার মনে হয় ঐ কথা! অত প্রেম থাকলে কি বিয়ে টেঁকে? ভালোবাসা হচ্ছে বেলজিয়ামের কাচের বাসন, তা প্রতিদিনের ব্যবহারের জন্য নয়। আমি জানি, আমি জানি!

—হাঃ, অদ্ভুত ধারণা তো তোমার! আচ্ছা জয়দীপ, যদি ওদের দু'জনের মধ্যে শুধু একজন ফিরে আসে, তাহলে কে ফিরে আসবে বলে তোমার ধারণা?

জয়দীপ কৃত্রিম ভাবে হা-হা করে হেসে বললো, আমি বলবো না! আমি এখন বলবো না। লেট আস কীপ আওয়ার ফিংগারস ক্রস্‌ড!

রোহিলা বললো, আমি বলছি, ঐ মেয়েটাই ফিরে আসবে। ঐ পুরুষটার প্রেম চলে যাবে ক'দিন বাদেই, তারপর সে মেয়েটাকে মুর্গীহাটার মুর্গীর মতন বিক্রি করে দেবে!

বন্দনাদি ভর্ৎসনা করে বললেন, যাঃ, কী অলক্ষুণে কথা বলছো! দেবদত্ত সেরকম মানুষই নয়। ও সহেলীকে একেবারে পুজো করে।

রোহিলা চোখ মুখ সঙ্কুচিত করে বললো, তুমি জানো না, বন্দনাদি, এখানকার বাইরের যে পৃথিবী, সেখানে ভালোবাসা বলে কিছু নেই। কিছু থাকতে পারে না! পুরুষরা যখন তখন মেয়েদের বিক্রি করে দেয়!

বন্দনাদি আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললো, এই তো এখানে একজন বাইরের মানুষ আছে, ওকে জিজ্ঞেস করে দ্যাখো, এটা সব জায়গায় সত্যি কি না!

রোহিলা বললো, ওকে আর আমরা বাইরে যেতে দেবো না, এখানেই ধরে রাখবো!

কুড়ি-একুশ বছরের একটি ছেলে হেঁটে আসছে রাস্তা দিয়ে। হাতে একটা

সদ্যকাটা পেয়ারা গাছের ডাল, তাতে কচি কচি পেয়ারা ফলে আছে কয়েকটা। আমাদের দিকে সে কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে।

বন্দনাদি জিজ্ঞেস করলো, বাবুসাহেব, ঐ ডালটা কোথা থেকে কাটলেন? কী হবে ওটা দিয়ে?

ছেলেটি বললো, ঐ যে মুরাদ বলে একটা লোক আছে, তার বাগান থেকে এনেছি। আমার বাগানে লাগাবো। আমার একটাও পেয়ারা গাছ নেই।

—কিন্তু ঐভাবে ডাল কেটে এনে পুঁতলে বাঁচবে নাকি? আমায় বললে পারতেন, কলম করে দিতাম!

ছেলেটি বললো, হ্যাঁ বাঁচবে। ঠিক বাঁচবে। তোর সঙ্গে এরা কারা রে?

—এরা তো এখানেই থাকে। আপনি দেখেননি আগে? অবশ্য একজন বাদে, ও নতুন এসেছে।

ছেলেটি ঠোঁট উল্টে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করলো। জয়দীপ বললো, বাবুসাহেব, কালই তো আপনার সঙ্গে কথা হলো আমার, মনে নেই?

ছেলেটি একই রকম ভঙ্গি করে বন্দনাদিকে জিজ্ঞেস করলো, তোরা কোথায় যাচ্ছিস?

—নদীতে। আপনি যাবেন নাকি?

—নাঃ!

—চলুন না, জয়দীপ আপনাকে সাঁতার শিখিয়ে দেবে!

—না যাবো না!

আমি ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারছিলুম না। এ ছেলেটি কে? বয়েসে এত বাচ্চা, অথচ বন্দনাদি আর জয়দীপকে তুই তুই করছে?

ছেলেটি একটু দূরে চলে যেতেই বন্দনাদি আর জয়দীপ এক সঙ্গে হো-হো করে হেসে উঠলো।

তারপর জয়দীপ বললো, একেবারে ধানী লংকা!

বন্দনাদি আমাকে আর রোহিলাকে বললো, তোরা খুব অবাক হয়েছিস তো? ঐ ছেলেটি কারুকে নিজের নাম বলে না, আর সবাই-এর সঙ্গে তুই তুই করে কথা বলে। এমন কি প্রভাসদার মতন বয়স্ক লোকদের সঙ্গেও। তাই আমরা প্রথমে নাম দিয়েছিলুম রাগীবাবু। তারপর নাম হলো তুই-বাবু। এখন নাম হয়েছে বাবু-সাহেব।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, তোমরা ওকে আপনি বলো? ঐ চ্যাংড়া ছোকরাকে?

—আমরা কেউ ওর কথায় রাগ করি না। তাতেই ও আস্তে আস্তে নরম হয়ে

যাবে ! এর মধ্যেই অনেকটা হয়েছে। আগে ওর সঙ্গে কথা বলতে গেলেই তেড়ে মারতে আসতো !

রোহিলা বন্দনাদির একটা হাত চেপে ধরে বললো, বন্দনাদি, তোমরা কি ভালো গো ? ও-রকম চ্যাটাং চ্যাটাং কথা শুনলে আমি তো মেজাজ ঠিক রাখতে পারতুম না !

বন্দনাদি বললো, ঐ ছেলেটা কীরকম দুঃখী তা ভাবো ! ঐ বয়েসের ছেলে, কিন্তু সমস্ত বিশ্ব সংসারের ওপর ওর রাগ। নিশ্চয়ই তীব্র ঘৃণা আর রাগ নিয়ে ওর বাড়ি-ঘর ছেড়ে চলে এসেছে ! চেহারা দেখে মনে হয় না ভালো বাড়ির ছেলে ?

জয়দীপ বললো, হয়তো ওর মা-বাবার মধ্যে প্রচণ্ড ঝগড়া !

বন্দনাদি বললো, ওকে একটা পেয়ারার কলমের চারা করে দিতে হবে। আমি চেষ্টা করবো, ওকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে ফেরৎ পাঠিয়ে দিতে। ঐ বয়েসের ছেলে এখানে থেকে কী করবে !

আমি জিজ্ঞেস করলুম, বন্দনাদি, ঐ ছেলেটি যে মুরাদ নামে একজনের কথা বললো, তার বাড়ি কি কাছেই ?

—হ্যাঁ, ঐ তো দেখা যাচ্ছে। কেন, তুই ওকে চিনিস নাকি ?

—একজনকে চিনি ঐ নামে, তবে ইনি সেই লোক কি না জানি না। একটু ঐ বাড়ির পাশটা ঘুরে যাবে ?

—চল !

মুরাদ সাহেবকে দেখেই আমার মাথা ঝিম ঝিম করতে লাগলো। যেন একজন মৃত মানুষকে দেখছি। ট্রেন লাইনে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন, বাড়িতে সেই মর্মে চিঠি লিখেও রেখে গিয়েছিলেন, যদিও তাঁর লাশ খুঁজে পাওয়া যায়নি। মুরাদসাহেব যে বেঁচে আছেন তা আমিও ঠিক বিশ্বাস করতে পারিনি। কিন্তু এই তো তাঁকে দেখতে পাচ্ছি জলজ্যান্ত।

দুটো পেয়ারা গাছের গুঁড়িতে একটা দড়ি বাঁধবার চেষ্টা করছেন মুরাদসাহেব। আমাদের দেখে চোখ তুলে তাকালেন।

আমি চেঁচিয়ে ডাকলুম, মুরাদ ভাই, চিনতে পারছেন আমাকে ?

ভুরু কুঁচকে এগিয়ে এসে তিনি বললেন, চেনা চেনা লাগছে, তুমি, তুমি নীলকমল না ?

—নীললোহিত। রফিক-এর ঘরে কতদিন আড্ডা দিয়েছি আপনার সঙ্গে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। তুমিও এখানে আমাদের দলে ভর্তি হলে নাকি ?

খুব ভালো কথা ! আরে, বন্দনা, তোমাকে দেখতেই পাইনি ! তুমিই নীলকমলকে এই জায়গাটার সন্ধান দিলে বুঝি !

বন্দনাদি বললো, ওকে সন্ধান দিতে হয় না, ও নিজেই খুঁজে বার করে। মুরাদ, তোমার বাগানের পেয়ারাগাছগুলোর জাত ভালো। আমি দু'একটা কলম করবো !

মুরাদসাহেব বললেন, যেদিন ইচ্ছে ! বন্দনা, তুমি আমার বাগানে আসবে, সে তো আমার সৌভাগ্য !

—আচ্ছা মুরাদ, কাল রাত্রে দ্বিতীয়বার মাদল বেজেছিল, তুমি শুনেছিলে ?

—হ্যাঁ !

—তুমি গিয়েছিলে ?

—যাবো না কেন ? মাদলের ডাক শুনলে যাবো না !

—কী হয়েছিল ?

মুরাদসাহেব আমাদের দিকে চেয়ে চুপ করে রইলেন। উনি আমাকে ভালোভাবে চিনতে পারেননি বা চিনতে চাইছেন না ! ওঁর কপালে একটা গভীর কাটা দাগ, ওটা আগে ছিল না। ট্রেন লাইনে ঝাঁপিয়ে পড়ার পরেও বেঁচে গেছেন কোনো ক্রমে ! অবশ্য একজন শক্ত-সবল, শিক্ষিত পুরুষ নিজের স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করে কেন রেলে গলা দিয়ে আত্মহত্যা করতে যায়, তা আমার বুদ্ধির অগম্য।

মুরাদসাহেব বললেন, বন্দনা, তোমরা তো জ্যোৎস্নার বাড়িতে যাচ্ছো, সেখানেই সব জানতে পারবে !

সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চারজনের চোখাচোখি হয়ে গেল। অর্থাৎ এক্ষুনি নদীর ধারে যাবার দরকার নেই, আগে জ্যোৎস্নার বাড়িটা ঘুরে যেতে হবে।

—আচ্ছা চলি, মুরাদ, পরে দেখা হবে !

—দাঁড়াও, বন্দনা, একটু দাঁড়াও।

গাছতলায় ফিরে গিয়ে মুরাদসাহেব অনেকগুলো পেয়ারা এনে দিলেন আমাদের। এবারে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি এখানে থাকছো তো ? তোমার গা থেকে কলকাতার গন্ধ একেবারে মুছে গেলে তারপর এসো আমার কাছে একদিন।

—খোদা হাফেজ, মুরাদভাই !

—আমার নামটা শুধু এক আছে, আমার আর সব কিছু মুছে গেছে। নীলকমল ! আমাকে ওসব বলবার দরকার নাই !

আমরা প্রত্যেকে একটা করে পেয়ারা কামড়াতে কামড়াতে হাঁটতে শুরু করলুম। বেশ সুস্বাদু পেয়ারা। মুরাদসাহেব এক সময় খুব আড্ডাবাজ, ফুর্তিবাজ ছিলেন, আমরা ওঁর বাড়িতে রেশমী কাবাব খেতে যেতাম, হঠাৎ গিয়ে পড়লেও কিছু না কিছু ভালো খাবার পেতামই। আজকের পেয়ারা যেন তারই স্মৃতি। মুরাদসাহেব এখানে গোমড়া হয়ে গেলেও বন্দনাদির সঙ্গে বেশ মধুর সম্পর্ক মনে হলো।

সেই কথা বন্দনাদিকে বলতেই বন্দনাদি একটুও দ্বিধা না করে বললো, হ্যাঁরে, এখানে অনেকেই আমাকে ভালোবাসে। শুধু এই জয়দীপটাই কক্ষনো আমার সঙ্গে ভালো করে কথা বলে না। এর মধ্যে একদিনও বললো না, আমি দেখতে ভালো কী মন্দ!

জয়দীপ বললো, আমি তো তোমাকে মেয়ে হিসেবে দেখি না, একজন বন্ধু হিসেবে দেখি। বন্ধুর আবার রূপের প্রশংসা কেউ করে নাকি?

রোহিলা আমাকে জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা নীলু, এই মুরাদ নামে লোকটা কী ওর বউকে খুন করে পালিয়ে এসেছে? মুখখানা কীরকম নিষ্ঠুরের মতন।

আমি বললুম, ঠিক তার উল্টো। বউয়ের ওপর রাগ করে উনি আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন!

বন্দনাদি বললো, ওসব কথা নয়, ওসব কথা নয়! ঐসব পুরোনো কথা তুললে এখানকার হাওয়া খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু জ্যোৎস্নার বাড়িটা ঠিক কোন্ দিকে? আমি যাইনি কখনো। জয়দীপ, তুমি চেনো?

জয়দীপ বললো, আমিও চিনি না। তবে চলো, পথে কারুকে জিজ্ঞেস করে নেওয়া যাবে।

এই সময়ে অনেকেই নিজের নিজের বাগানে বা ক্ষেতে কাজ করে, তাই পথে বিশেষ মানুষ-জন নেই। এখানে গাছ-পালা এত বেশি যে রাস্তা থেকে চোখেই পড়ে না কোথায় কোথায় বাড়ি আছে। এক সময় যারা এসে এখানে প্রথম উপনিবেশ বানিয়েছিল তাদের রুচি আছে স্বীকার করতে হবে।

দু'এক জায়গায় জিজ্ঞেস করতে করতে আমরা জ্যোৎস্নার বাড়িতে পৌঁছে গেলাম কিছুক্ষণের মধ্যেই। সেই বাড়ির সামনে দশ-বারো জন মানুষের নিঃশব্দ জমায়েত। দেখলেই বুকটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে। মনে পড়ে কোনো শোকের বাড়ির কথা।

বন্দনাদি বিবর্ণ মুখে বললো, কী হয়েছে এখানে?

বলেই সে ছুটে গেল আগে।

জয়দীপ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বললো, আমি যাবো না! আমি এসব সহ্য করতে পারি না।

আমি বললুম, ঠিক আছে, আমরা এখানেই দাঁড়াই। বন্দনাদি দেখে আসুক আগে, ওর মুখ থেকেই শুনবো!

জয়দীপের মুখখানা বদলে গেছে। চোখদুটি বিস্ফারিত। সে ফিস ফিস করে বললো, না, আমি এখানেও দাঁড়াতে চাই না। আমি জানি, কী হয়েছে! আমি নদীর ধারে চলে যাচ্ছি। তোমরা পরে এসো!

জয়দীপ উল্টো দিকে ফিরে হন হন করে চলে গেল।

রোহিলা বললো, চলো, তুমি আর আমিও নদীর ধারে চলে যাই। বন্দনাদি ঠিক বুঝবে!

কিন্তু আমার যে অদম্য কৌতূহল। আমার পা গেঁথে গেছে মাটিতে, সব কিছু না জেনে যাওয়ার উপায় নেই।

আমি রোহিলার বাহুতে চাপড় মেরে বললুম, আগে ভয় পাচ্ছো কেন? আগে দেখাই যাক না ব্যাপারটা কী!

জ্যোৎস্নার বাড়িটা ছোট। দুটি মাত্র ঘর, সামনে কোনো বারান্দা নেই, পেছন দিকে আছে কিনা কে জানে। তার বাগানটিও বিশেষ বড় নয়। সেখানে লাল রঙের ডাঁটা শাক ফলেছে, আর রয়েছে দুটো বড় ইউক্যালিপটাস গাছ। তার বাড়ির সামনের দিকটা অনেকটা ফাঁকা, আর বাড়ি ঘর নেই। শোবার ঘরে জানলা খুলে সে সব সময় আকাশ দেখতে পারে।

তার বাড়ির বাইরে যে-ক'জন লোক দাঁড়িয়ে আছে তারা কেউ আমার চেনা নয়। তারা কথা বলছে অতি নিম্ন স্বরে, এখান থেকে শোনা যাচ্ছে না। বন্দনাদি ঢুকে গেছে বাড়িটার মধ্যে।

আমি রোহিলার হাত ধরে টেনে চলে এলুম সেই জনতার মধ্যে। একজনকে জিজ্ঞেস করলুম, কী হয়েছে? কী হয়েছে?

লোকটির মুখে কার্ল মার্কসের মতন দাড়ি, মাথার চুলে বাবড়ি, চোখদুটি প্রশান্ত। আমার প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে শুধু একটা আঙুল তুলে বাড়ির ভিতরটা দেখিয়ে দিল।

এখানকার লোকেরা কেউ প্রকাশ্যে কৌতূহল দেখায় না, অন্যদের কৌতূহল প্রবৃত্তিকেও উৎসাহ দিতে চায় না। এক এক সময় এই নিরুত্তাপ ভাবটা আমার অসহ্য লাগে!

এই বাড়ির মধ্যে ঢুকতে নিশ্চয়ই কোনো বাধা নেই। কেউ কেউ গেছে তো

দেখা যাচ্ছে। একটা ঘরে বেশ কয়েকজন নারী-পুরুষের পিঠ।

রোহিলাকে বললুম, চলো, ভেতরে গিয়ে দেখি!

রোহিলা ভয়ার্ত মুখে বললো, না!

অধীর প্রতীক্ষা নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম সেখানে। বন্দনাদি নিশ্চয়ই আমাদের খবর দিতে আসবে।

একটু পরেই সেই বাড়ির মধ্যে একটা চাঞ্চল্য দেখা গেল। কারা যেন কাকে কী বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করছে। তারপর সবাই একদিকে সরে গেল, একজন লোক টলতে টলতে বেরিয়ে এলো বাইরে।

লোকটিকে দেখে আমি স্তম্ভিত। নীহারদা! জঙ্গলের মধ্যে জলাশয়ের পাশে শুয়ে থাকা সেই মুমূর্ষু মানুষটি!

বন্দনাদি আর ইসমাইলসাহেব সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এসে নীহারদাকে ধরবার চেষ্টা করলেও তিনি নিজেই মোটামুটি সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। প্রণামের ভঙ্গিতে হাতজোড় করে কম্পিত গলায় আমাদের উদ্দেশ্যে বললেন, আমায় ক্ষমা করুন। বেঁচে থাকার জন্য...মানুষ কত কী-ই না করে! .. আমি...হয়তো এ যাত্রা...বেঁচে যাবো! আপনারা..আমাকে ক্ষমা করুন!

আমার পাশ থেকে একজন চেঁচিয়ে উঠলো, সব ঠিক আছে, নীহারদা! আপনি সুস্থ হয়ে উঠছেন দেখে আমরা দারুণ খুশী হয়েছি। আপনি শুয়ে পড়ুন, বিশ্রাম নিন!

জনতার প্রত্যেকের ঠোঁটেই খুশীর ঢেউ। দু'তিনজন এক সঙ্গে হাত তুলে বললো, আমরা আপনাকে ফিরিয়ে এনেছি, নীহারদা। আপনি আরও অনেকদিন আমাদের মধ্যে থাকবেন।

নীহারদার ঠোঁট কাঁপছে। তিনি আরও কিছু বলতে চান। বন্দনাদি আর ইসমাইল তাকে ধরে ধরে ভেতরে নিয়ে গেল।

রোহিলা আমার দিকে প্রশ্নমাখা চোখে তাকালো। সব ব্যাপারটা আমার কাছেও দুর্বোধ্য রয়ে গেল। মুমূর্ষু নীহারদা জঙ্গল থেকে জ্যোৎস্নার বাড়িতে এলেন কী করে? তার সঙ্গে কাল রাতে মাদল বাজার সম্পর্ক কী!

আমাদের কাছের ভিড়টা পাতলা হয়ে গেল। এরা নীহারদাকে দেখবার জন্যই দাঁড়িয়েছিল। অর্থাৎ এরা জানতো যে নীহারদা ভেতরে আছেন।

আমরা অপেক্ষা করতে লাগলুম বন্দনাদির জন্য।

রোহিলা বললো, আমার এইটুকু জীবনে কত তাড়াতাড়ি সব ঘটনা ঘটছে, তাই না? আমিও সেই জন্য তাড়াতাড়ি বড় হয়ে উঠছি।

আমি বললুম, তুমি তো নীহারদাকে আগে দেখোনি। আমি কাল বিকেলে দেখেছি জঙ্গলে শুয়ে থাকতে। মৃত্যুশয্যায়। উনি যে আবার উঠে দাঁড়াতে পারবেন, হাঁটতে পারবেন, তা কল্পনাও করতে পারি নি!

—সত্যি সত্যি কি অসুখ হয়েছিল?

—ঠোঁটদুটো একেবারে চুপসে গিয়েছিল। কোনো সুস্থ মানুষের ঠোঁট ওরকম হতে পারে না! আমি আগে কখনো দেখিনি।

খানিক বাদেই বন্দনাদি বেরিয়ে এলো হাস্যোজ্জ্বল মুখে। আমাদের কাছে এসে বললো, চল, এবারে স্নান করতে যাই। রোহিলা, তুমি অধৈর্য হয়ে উঠছো নিশ্চয়ই। জয়দীপ কোথায় গেল?

—জয়দীপ এগিয়ে গেছে।

—মানুষের জীবনটা কী আশ্চর্য রহস্যময়, তাই না-রে নীলু,এমন এমন সব কাণ্ড ঘটে যা আমরা স্বপ্নেও ভাবতে পারি না!

—দেয়ার আর মোর থিংস ইন হেভেন অ্যান্ড আর্থ, হোরেসিও...। তা হোরেসিও, আজকের পরমাশ্চর্য ব্যাপারটা কী?

—নীহারদাকে দেখলি না? উনি সুস্থ হয়ে উঠবেন, পায়ে হেঁটে এতখানি আসবেন, কেউ কি বিশ্বাস করতে পেরেছিল? কাল যে আমরা সবাই মিলে প্রার্থনা করলুম, নীহারদা, ফিরে এসো, নীহারদা ফিরে এসো! তার জন্যেই এটা হয়েছে!

—যাঃ, তা কি কখনো সম্ভব! বন্দনাদি, আমি সন্দেহবাদী মানুষ। নীহারদা স্ট্যান্ট দেননি তো? রোহিলার মনেও প্রশ্ন জেগেছে যে নীহারদা সত্যিই অসুস্থ হয়ে ছিলেন কি না!

—তোরা কী বলছিস রে? সাধ করে কেউ কি জঙ্গলে গিয়ে ঐ মৃত্যুশয্যায় শুয়ে থাকে? তাছাড়া এখানে দু'জন ডাক্তার আছে। এককালের খুব নাম-করা ডাক্তার। সব ছেড়ে চলে এলেও তারা ডাক্তারি বিদ্যেটা তো আর ভোলেনি! সেই ডাক্তার দু'জন আগে পরীক্ষা করে দেখেছেন যে নীহারদার বাঁচার আর কোনো আশা নেই। তারপরই তাঁকে জঙ্গলে নিয়ে শুইয়ে দেওয়া হয়েছিল!

—ইনি জ্যোৎস্নার বাড়িতে এলেন কেন? কাল রাত্তিরে দ্বিতীয় বার মাদল বেজেছিল এই জন্যে?

—আরও আশ্চর্য ঘটনাটা তো এখনো জানিস না। পরশু রাতে জ্যোৎস্না যে একজনকে দেখে ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিল, তা ঐ নীহারদাকে দেখেই। নীহারদাই পরশু এসেছিলেন।

—অ্যাঁ ! উনিই এসে জ্যোৎস্নার গলা টিপে ধরেছিলেন।

রোহিলা কুঁকড়ে গিয়ে বললো, বন্দনাদি, আর বলো না, আমার ভয় করছে ! ঐ বুড়োটা জঙ্গল থেকে এতখানি এসে জ্যোৎস্নার গলা টিপে ধরেছিল ? ওরে বাবারে ! ওরে বাবারে !

বন্দনাদি কুলকুল করে হেসে বললো, এই রোহিলাটা দেখছি সত্যিই বাচ্চা ! আরে না, শোন, গলা টিপে ধরেনি। ওটা ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপার। সব ব্যাপারটা খুলে বলছি, শোন ! নীহারদাই আজ বলেছে। ঐ জঙ্গলের মধ্যে নীহারদা বেশ কয়েকদিন ধরে মৃত্যুশয্যায় শুয়ে ছিলেন তো ? শরীরটা অশক্ত হয়ে গেলেও মনটা তো ঠিকই ছিল ! ঐ অবস্থায় শুয়ে শুয়েও নীহারদার মনে ঈশ্বর চিন্তা আসেনি, পুরোনো জীবনের কথা মনে পড়েনি, শুধু তিনি জ্যোৎস্নার কথা ভেবেছেন। চিৎ হয়ে শুয়ে শুয়ে আকাশ দেখতে দেখতে তিনি ভাবতেন, জ্যোৎস্নাও যদি তাঁর পাশে শুয়ে আকাশ দেখতো ! জ্যোৎস্নাকে উনি ভালোবাসতেন। জ্যোৎস্না তা জানতো না। সেই ভালোবাসার জোরেই উনি পরশুদিন মাঝ রাত্রে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, এতখানি রাস্তা হেঁটে এসেছিলেন। ভেবে দ্যাখ, কী অসম্ভব মনের জোর। জ্যোৎস্নার বাড়ির খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে উনি দেখলেন, জ্যোৎস্না ঘুমিয়ে আছে। উনি তখন জ্যোৎস্নার মুখখানি দু'হাতে ধরে আদর করতে গিয়েছিলেন একটু। জ্যোৎস্না হঠাৎ জেগে উঠে কে কে বলে চিৎকার করে ওঠে। নীহারদা তখন ঘাবড়ে যান, সেই সময় বোধহয় জ্যোৎস্নার গলায় হাতের চাপ লেগে যায় !

—অন্য লোক এসে পড়ায় উনি দৌড়ে পালিয়েছিলেন ? একজন মুমূর্ষু রোগী দৌড়োয় ?

রোহিলা বললো, বন্দনাদি, আমার এখনো ভয় করছে এসব শুনতে !

বন্দনাদি বললো, মনের জোরে সবই সম্ভব। মৃগী রুগীদের দেখিসনি, কী রকম অসম্ভব গায়ের জোর হয়ে যায় ? নীহারদা ভয় পেয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। কী করে অতটা গেল, সে কথা তার ভালো করে মনেই নেই।

—তারপর আবার কাল রাত্তিরে এসেছিলেন।

—হ্যাঁ। ওঁর মনে হয়েছিল, জ্যোৎস্নাকে অন্তত একটা চুমু না খেলে উনি মরে গিয়েও তৃপ্তি পাবেন না। কিংবা তৃপ্তিতে মরতে পারবেন না ! কিন্তু কাল রাত্তিরে জ্যোৎস্নার ঘরে একটা মাদল রাখা ছিল। জ্যোৎস্নাও জেগে ছিল। তখন বৃষ্টি পড়ছিল, আকাশে আলো ছিল না। ঘরের মধ্যে একটা ছায়ামূর্তি দেখেই জ্যোৎস্না চিৎকার করে ওঠে, তারপর মাদল বাজিয়ে দেয় !

রোহিলা বললো, ওরে বাবারে, আমি হলে তো ভয়েই মরে যেতাম ! আমি পুরুষ মানুষদের ভয় পাই না, কিন্তু যদি ভূত হয়....

বন্দনাদি বললো, ধুৎ ! ভূত আবার কী ? অত ভয় পেলে এখানে একা একা থাকা যায় না !

আমি জিজ্ঞেস করলুম, তারপর কী হলো ?

বন্দনাদি বললো, কাল রাতে জ্যোৎস্নার চিৎকার শুনে নীহারদা তাঁর মনের জোর রাখতে পারেননি, ঐখানেই ঝুপ করে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। জ্যোৎস্নার চিৎকার আর মাদলের শব্দ শুনে প্রথমে দু'তিনজন দৌড়ে এসেছিল। তারা নীহারদাকে ওখানে ঐভাবে পড়ে থাকতে দেখে আবার মাদল বাজিয়ে দেয়। তাতে আরও কয়েকজন আসে। দু'জন ডাক্তারের মধ্যে রজত ডাক্তার এসে পৌঁছোয় আগে। সে চিকিৎসা শুরু করে দেয়। এক সময় নাকি নীহারদার হার্ট বীট থেমে গিয়েছিল। তখন রজত ডাক্তার জ্যোৎস্নাকে বলে, উনি তোমার জন্যই তো এসেছিলেন, তুমি ওর ঠোঁটে ঠোঁট দিয়ে আর্টিফিসিয়াল রেসপিরেশান দাও ! তাতে কাজ হবে। সত্যিই কাজ হয়েছে। জ্যোৎস্না বোধহয় অন্তত এক শো বার নীহারদার ঠোঁটে ঠোঁট দিয়ে চুমু খাওয়ার মতন ফুঁ দিয়েছে। দেখলি—তো, নীহারদা শেষ পর্যন্ত উঠে দাঁড়াতে পেরেছেন, বাইরে এলেন জেদ করে, সবার সঙ্গে কথা বললেন !

রোহিলা বললো, এখনো যেন বিশ্বাস করতে পারছি না। উনি সত্যি বেঁচে আছেন ? কিছু খাবার খেয়েছেন ?

বন্দনাদি বললো, হ্যাঁ, চিকেন সুপ খেয়েছেন দু'একবার। শেষবার তো আমিই খাইয়ে দিলাম !

আমি জিজ্ঞেস করলুম, আচ্ছা বন্দনাদি, আর একটা কথা জিজ্ঞেস করি। মৃত্যুশয্যায় শুয়ে নীহারদা বলেছিলেন, উনি এখানকার কোনো একজনকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। সে কে ? কী হয়েছিল ?

বন্দনাদি মৃদু হেসে বললো, তুই নিশ্চয়ই তা জানিস বা বুঝতে পেরেছিস, তবু আমার কাছে যাচাই করে নিচ্ছিস, তাই না ? সেটা বছর খানেক আগেকার ব্যাপার। নীহারদা ছিলেন সকলের শ্রদ্ধেয়, বুঝলি। অনেকেই নানা ব্যাপারে নীহারদার কাছে পরামর্শ নিতে যেত। উনি ছিলেন নির্লোভ, মুক্তপুরুষ। তবু উনি একদিন নিরালায় জ্যোৎস্নাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে গিয়েছিলেন, জ্যোৎস্নার মেজাজ তখন ভালো ছিল না। সে উল্টে নীহারদাকে দুই থাপ্পড় কষায় !

রোহিলা বললো, বেশ করেছিল !

—তুমি সব ঘটনাটা জানো না, আগে শোনো ! ঘটনাটা জানাজানি হয়ে যায়। ওরকম থাপ্পড় খেয়েই নীহারদা প্রথম অসুস্থ হয়ে পড়েন। একটা মানসিক আঘাত তো। সেই ঘটনা শুনে আমরা জ্যোৎস্নাকে খুব বকাবকি করেছিলুম ! নীহারদা বয়স্ক মানুষ, অনেক ব্যাপারেই শ্রদ্ধেয়, যদি তাঁর একবার একটু চুমু-টুমু খাওয়ার ইচ্ছে হয়, তাতে অত আপত্তি করার কী আছে ? জ্যোৎস্নার আপত্তি ছিল অন্য। চুমু খেতে তার আপত্তি ছিল না। কিন্তু সে বলেছিল, নারীর একটা স্বাভাবিক অধিকার আছে পুরুষের স্তুতি পাবার। নীহারদা যতই শ্রদ্ধেয় হোক, চুমু খাবার চেষ্টা করার আগে তাঁর তো উচিত ছিল একবার অন্তত হাঁটু মুড়ে বসে জ্যোৎস্নার কাছে দু'একটা ভালোবাসার কথা বলা !

রোহিলা বললো, জ্যোৎস্না ঠিকই তো বলেছে !

বন্দনাদি বললো, রোহিলা, সবাই সব কথা মুখে প্রকাশ করতে পারে না। যারা ভালোবাসে কিন্তু মুখে বারবার ভালোবাসার কথা বলে না, তারাই খাঁটি। মানুষ চিনতে হয়, মানুষের মুখ দেখে বুঝে নিতে হয়। যাই হোক, সে সব চুকে গেছে। কৃত্রিম নিশ্বাস দেবার অজুহাতে জ্যোৎস্না আজ নীহারদাকে অন্তত একশো বার চুমু খেয়েছে। তাইতেই নীহারদা চাঙ্গা হয়ে উঠছেন ক্রমশ। এখানে তো অক্সিজেন টেন্ট নেই। অন্য কোনো ব্যবস্থাও নেই। নীহারদা মাঝে মাঝে সিংক করে গেলে রজতডাক্তার চেঁচিয়ে উঠছে, অক্সিজেন ! অমনি জ্যোৎস্না এসে নীহারদার ঠোঁটে ঠোঁট ঠেকাচ্ছে।

হাতের পুঁটলিটা একবার শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে ফের লুফে নিয়ে বন্দনাদি বললো, আজকের দিনটাতে এটাই সবচেয়ে সুন্দর খবর !

আমি বললুম, বন্দনাদি, তা হলেই দেখা যাচ্ছে, তোমাদের প্রার্থনাতে উনি সুস্থ হয়ে ওঠেন নি। উনি সেরে উঠেছেন একটা চুমুর জন্য। যতদূর মনে হয়, ঐ একই কারণে আমিও আরও একশো বছর বাঁচবো !

॥ ১০ ॥

নদীর ধারে আজ বেশ জনসমাগম হয়েছে। গরম পড়ে গেছে যথেষ্ট। আমরা একটা নির্জন জায়গা খুঁজতে লাগলাম। মাঝে মাঝে বড় বড় পাথরের চাঁইতে নদীটা অনেক জায়গায় আড়াল হয়ে আছে। সেরকম একটা পাথরে হেলান দিয়ে

আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল জয়দীপ।

ডান দিক ধরে খানিকটা হাঁটতে হাঁটতে চোখে পড়লো একটা ঝুপসি গাছ তলায় আজও ক্যানভাস সাজিয়ে এক মনে ছবি এঁকে চলেছে বসন্ত রাও।

ওর সঙ্গে রোহিলার আলাপ করিয়ে দেবো বলেছিলাম।

আমরা আস্তে আস্তে গিয়ে দাঁড়ালাম বসন্ত রাও-এর পেছনে। ভ্যান গগের সাইপ্রেস গাছের ছবির মতন কয়েকটি দেবদারু গাছের অবয়ব ফুটে উঠেছে ক্যানভাসে। তার ওপরে কি গ্রহণ-লাগা সূর্য ?

বেশ কয়েক মিনিট আমাদের উপস্থিতি টেরই পেল না বসন্ত রাও। শিল্প-চর্চাও গভীর ধ্যানের মতন, চার-চারজন মানুষের নিঃশ্বাস ওর গায়ে লাগছে, তবু হুঁশ নেই।

বন্দনাদি চোখের ইশারায় আমাকে বললো, এখন ডাকিস না !

মুনি ঋষিদের ধ্যানভঙ্গ করালে তাঁরা অভিশাপ দিতেন। শিল্পীদের কাজে সে ভয় নেই। তাছাড়া আমি শিল্পীদের একটু একটু চিনি, দুটি রূপসী যুবতীকে দেখলে যে-কোনো শিল্পীই খুশী মনে কাজ বন্ধ করতে পারে !

ঠিক যা ভেবেছি তাই, ওর নাম ধরে ডাকতেই মুখ ফেরালো, আমাদের চারজনের মধ্যে বেছে বেছে ও বন্দনাদি ও রোহিলাকে দ্রুত দেখে নিল, রোহিলার মুখে একটু বেশি কৌতূহলী দৃষ্টি ফেললো, তারপর হাসি মুখে বললো, কী ব্যাপার, পুরো একটা ডেলিগেশান ! আমার ছবি দেখতে নাকি ? আমি কৃতার্থ !

বন্দনাদি বললো, বসন্ত রাও, তুমি নীহারদার খবর শুনেছো ?

হাত থেকে তুলিটা নামিয়ে রেখে সে বললো, আমি কাল রাত্রে মাদলের ডাক শুনে জ্যোৎস্নার বাড়িতে গিয়েছিলাম। জীবন কী মধুময়, বলো, বন্দনা ? জ্যোৎস্না মেয়েটি ধন্য, তার জন্য একজন মানুষ মৃত্যুকে অস্বীকার করেছে !

আমি বললুম, আমরা এই মাত্র দেখে আসছি, নীহারদা ভালো আছেন। পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠেছেন !

বসন্ত রাও বললো, নীহারদা এখন মরে গেলেও ক্ষতি নেই। একটি চুম্বনের জন্য সে মৃত্যুশয্যা থেকে উঠে এসেছিল, এইটুকুই যথেষ্ট। দুঃখের বিষয় আমাদের এখানে একজনও কবি নেই, তা হলে এই কাহিনীটা লিখে অমর করে রাখতে পারতো ! নীললোহিত, তুমি কি কবি ?

আমি দু'দিকে মাথা নেড়ে বললুম, নাঃ !

বন্দনাদি বললো, বসন্ত রাও, তুমি তো এই ঘটনা নিয়ে একটা ছবি আঁকতে পারো ! আমরা সেই ছবি গীর্জার গায়ে টাঙিয়ে রাখবো !

বসন্ত রাও বললো, তোমার অনুরোধ আমি অবশ্যই মান্য করতাম, বন্দনা, যদি আমার সে ক্ষমতা থাকতো। কিন্তু আমি তো মনুষ্য-মুখ আঁকি না, কোনো গল্প আঁকতে পারি না, আমি শুধু ল্যাণ্ডস্কেপ করি।

বন্দনাদি বললো, হ্যাঁ, তা তো ঠিক। তোমার যত ছবিই আমি দেখেছি, সবই গাছ-পালা আর পাহাড় পর্বত নিয়ে।

বসন্ত রাঁও বললো, আমি কবিতা লিখতে পারি না, কিন্তু কাল রাতে আকাশ-প্রিয়া জ্যোৎস্নার বাড়িতে মহাকাশের মতন নীহারদাকে দেখে আমার চেনা একটি কবিতার কয়েকটি লাইন মনে পড়ছিল!

হে প্রিয় নিঃশ্বাস তুমি জাহাজের পতাকা ওড়াও
হে প্রিয় নিঃশ্বাস তুমি পুষ্পবৃষ্টি আনো
আকাশ এসেছে কাছে, আরো কাছে এসো
জলের দর্পণ থেকে তুলে দাও নক্ষত্রের মালা
হিরণ্য গর্ভের দ্যুতি রাখো এই হাতে
আমি চলে যাবো, তাকে এই সমস্ত মহিমা
আমি দিয়ে যেতে চাই....

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে আবার বললো, আমরা সবাই একা, তবু যাবার আগে কোনো একজনকে সব কিছু দিয়ে যেতে ইচ্ছে হয়। তোমরা দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বসো! বন্দনা, তোমাকে অনেকদিন দেখিনি!

বন্দনাদি বললো, আমরা নদীতে স্নান করতে যাচ্ছি, তুমি আসবে আমাদের সঙ্গে?

—আমাকে যে আগে ছবিটা শেষ করতে হবে। তোমরা বসো না একটু!

আমি রোহিলাকে দেখিয়ে বললাম, বসন্ত রাও, এই মেয়েটিকে চিনতে পারছো?

—না, দেখিনি তো আগে!

—হ্যাঁ দেখেছো। কাল আমরা যে ঘন কালো শাড়ী পরা মহিলাকে দেখেছিলাম....

—সেই কৃষ্ণবসনা? এই সে নাকি?

—হ্যাঁ। এখন জিনস্ পরেছে, তাই চেনা যাচ্ছে না!

—ওরে বাবা! সত্যি চেনবার উপায় নেই! আগে তো দেখে মনে হতো....

রোহিলা ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞেস করলো, কী মনে হতো? কী মনে হতো বলো!

বসন্ত রাও লাজুক হেসে বললো, সত্যি কথা বলবো? তোমাকে দেখে একটু

ভয় ভয় করতো। মনে হতো তুমি কৃষ্ণ-ক্ষ্যাপা। ঐ কালো পোষাক তোমাকে মানায় না, তুমি আর পরো না!

—এই নীললোহিতও আমাকে সেই কথা বলেছে। আচ্ছা ওটা আর পরবো না!

আমি বললুম, বসন্ত রাও, এই মেয়েটির বয়েস তিন বছর। তিন বছর আগে থেকে ও ছবি আঁকতে শুরু করেছে। কিন্তু নিজের ছবি নিজেই পুড়িয়ে ফেলে। তুমি একটু দেখে দিও তো, ওর সত্যিই ছবি আঁকার হাত আছে কি না!

বসন্ত রাও হালকা সুরে বললো, তুমি ছবি আঁকো? তুমি নিজেই তো একটা ছবি।

এই কথায় রোহিলার মুখে একটা ম্লান ছায়া পড়লো। সে কাতর গলায় বললো, ও কথা বলো না! আমি ছবি নই, আমি মাংসের পুতুল নই। আমি মানুষ। তুমি, বন্দনাদি, নীললোহিত, জয়দীপ এদের মতন আমিও একজন মানুষ। যদি এখনো পুরোপুরি মানুষ না হয়ে থাকি, তোমরা আমাকে মানুষ করে দাও!

বন্দনাদি বললো, ঠিকই বলেছে রোহিলা। শিল্পীরা আমাদের বড্ড মেয়ে মেয়ে ভাবে, সব সময় কল্পনার রং মেখে দেখতে চায়। যেন আমরা স্বাভাবিক মানুষ নই!

বসন্ত রাও একথায় তেমন গুরুত্ব না দিয়ে রোহিলাকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি ওকে বন্দনাদি বললে কেন? ওকে আগে চিনতে?

বন্দনাদি বললো, না। ঐ নীলু আমাকে বন্দনাদি বলে, রোহিলাও তাই শুনে শুনে...

আমি বললুম, ও তো বাচ্চা মেয়ে। শুনে শুনেই সব শিখবে!

বসন্ত রাও বললো, তোমার বয়েস তিন বছর? হাউ ইন্টারেস্টিং! তোমার মুখে খানিকটা রোদ এসে পড়েছে, তাতে সত্যিই যেন একটা শৈশবের ছায়া দেখতে পাচ্ছি।

বসন্ত রাও এমনভাবে কয়েক মুহূর্ত রোহিলার দিকে তাকিয়ে রইলো যে আমার মনে হলো, এতকাল সে শুধু ল্যাণ্ড স্কেপ এঁকে এলেও এবার রোহিলাকে মডেল করে ও বোধহয় হিউম্যান ফিগারও আঁকতে শুরু করবে।

এতক্ষণ জয়দীপ একটাও কথা বলে নি, এক পাশে সরে দাঁড়িয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে একটা গাছের কয়েকটি পাতা দেখছিল, এবারে সে খানিকটা অধৈর্যভাবে বললো, তোমরা কি স্নান করতে যাবে না? সূর্য যে মাথার ওপর

চলে এলো !

বন্দনাদি বললো, হ্যাঁ চলো, চলো ! বসন্ত রাও, তুমি পারলে চলে এসো পরে !

বসন্ত রাও উঠে দাঁড়িয়ে বললো, এমন লোভনীয় ব্যাপার, আমি আর ছবিতে মন বসাতে পারবো না ! চলো, আমিও যাবো তোমাদের সঙ্গে !

বন্দনাদি জয়দীপের পিঠে একটা চাপড় মেরে বললো, এই ছেলেটা কী অদ্ভুত না ? এতক্ষণ একটা গাছের মতন ঠায় দাঁড়িয়েছিল, আমরা যে কত কথা বললাম, বসন্ত রাও একটা অপূর্ব কবিতা শোনালো, তাতে ওর ভ্রূক্ষেপ নেই। কিছুতেই ওর এই স্বভাবটা ছাড়াতে পারছি না !

বসন্ত রাও বললো, তুমি চিন্তা করো না বন্দনা। জয়দীপ ঠিক আছে। শুধু মাঝে মাঝে ওর মনটা উধাও হয়ে যায়।

জয়দীপ একথার প্রতিবাদ করে বললো, না, আমার মন উধাও হয় না। আমি এক এক সময় আমার মনটা দুই ভুরুর মাঝখানে, কপালের এই জায়গাটায় স্থির করে রাখি। তখন অন্যদের কোনো কথা শুনতে পাই না।

বসন্ত রাও বললো, তাহলে তুমি তো দেখছি হঠযোগী !

জয়দীপ থমকে দাঁড়িয়ে বললো, আমি যাবো না !

বন্দনাদি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, কেন, কী হলো ?

জয়দীপ বললো, তোমরা যাও, আমি এখন স্নান করতে যাবো না। আমার ইচ্ছে করছে না !

বসন্ত রাও জয়দীপকে জড়িয়ে ধরে বললো, তুমি আমার ওপর রাগ করলে ? হঠযোগী বলেছি বলে ? সীতা রাম, সীতা রাম ! আমি একটা বেহুদা লোক, যখন যা মনে আসে তাই বলি, আমার কথার কি কোনো মূল্য ধরতে আছে !

কাঠের পুতুলের মতন সে জয়দীপকে টানতে টানতে নদীর ধারে নিয়ে চললো।

বন্দনাদি হাসছে। আমি তাকে বললুম, এখানে শুধু রোহিলার বয়েসই তিন বছর নয়, আরও অনেক বাচ্চা আছে !

বন্দনাদি বললো, যা বলেছিস ! এই সব বাচ্চাদের জেদ সামলাতে এক এক সময় সত্যি বেশ মুশকিল হয়।

পর পর দু'দিনের বৃষ্টিতে নদীর জল বেশ বেড়েছে। রীতিমতন স্রোত দেখা যাচ্ছে। আমি আসবার সময় কোমর জলের বেশি ছিল না। এখন মাঝখানে নিশ্চয়ই ডুব-জল।

বন্দনাদি বললো, যে-যা পরে আছো তাই পরেই নেমে যাও। ভিজে গায়ে বাড়ি ফিরলেই হবে।

রোহিলারই সবচেয়ে বেশি আগ্রহ ছিল নদীতে স্নান করার, কিন্তু এখন তার মুখখানি আড়ষ্ট হয়ে গেছে।

সে অস্ফুট স্বরে বললো, এত জল ! আমি নামবো কী করে ? আমি যে সাঁতার জানি না !

বন্দনাদি বললো, তাতে কী হয়েছে। আমরা তো আছি।

—না বন্দনাদি ! আমার জলকে বড় ভয়। আমি একবার ডুবে গিয়েছিলাম।

—এখানে কোনো ভয় নেই। আমরা তোমাকে সাঁতার শিখিয়ে দেবো। আজ থেকেই শুরু হয়ে যাক।

—আমার দ্বারা সাঁতার শেখা হবে না কখনো। আমি যে ভয় পাই !

—এখানে যখন এসেছো, তখন সব শিখে যাবে। এখানে সবাই সাঁতার জানে। আমি আগে জাম গাছ আর জামরুল গাছের তফাৎ জানতুম না। শহরের মেয়ে, গাছপালা কি ভালো করে দেখেছি কখনো ? অথচ এখন আমি কলমের চারা বানাতে পারি। আমার বাগানে দেখেছো তো কত বড় বড় বেগুন হয়েছে ! তুমিও সব পারবে।

—তোমরা দুজনে আমার হাত ধরে থাকো, বন্দনাদি !

—ঠিক আছে, নীলু, ধর তো একটা হাত !

আমরা দুজনে দুদিক থেকে ধরে ধরে জলে নামালুম ওকে। জল বেশ ঠাণ্ডা। শিশুর চোখের মতন টলটলে। এত মাদকতা লাগছে যেন এর আগে আমি কোনোদিন নদীতে স্নান করিনি।

রোহিলা নানারকম উঃ, আঃ, ভয় করছে, আর যাবো না ইত্যাদি বলতে থাকলেও আমরা প্রায় জোর করেই ওকে নিয়ে এলাম বুকজল পর্যন্ত। তারপর বন্দনাদি বললো, তুই এবার ছেড়ে দে, নীলু !

সঙ্গে সঙ্গে বন্দনাদিও ছেড়ে দিয়ে একটু দূরে সরে গিয়ে হাঁটতে লাগলো।

রোহিলার প্রায় কেঁদে ফেলবার জোগাড়।

বন্দনাদি বললো, শোনো, এইটুকু জলে কেউ ডুবে যায় না। তাছাড়া, আমরা তো আছিই। আজ তোমার প্রথম দিনের ট্রেনিং হলো এখান থেকে তোমার একা একা পাড়ে ফিরে যাওয়া।

রোহিলা চেঁচিয়ে উঠলো। আমি পারবো না, আমি পারবো না !

বন্দনাদি বললো, এক্ষুনি তো ফিরছো না। এখন দাঁড়াও। পায়ের তলা দিয়ে

বালি সরে গেলে পা জোর করে **চেপে** রাখো !

বন্দনাদির সাঁতারের ট্রেনিং ব্যাহত হলো। একটু দূরে দুজন লোক স্নান করছিল, তাদের একজন এগিয়ে এসে রোহিলার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, তুমি — তুমি সুলোচনা না ?

রোহিলার উচ্ছলতা থেমে গেল। লোকটির দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে শান্ত গলায় বললো, না, আমি রোহিলা !

লোকটির মাথায় টাক, জোড়া ভুরু খুব ঘন, মুখখানা অভিমানী ধরনের। জল সরিয়ে আর একটু কাছে এসে সে বললো, তোমার চেহারা অনেক পাল্টে গেছে, মাথায় বড় চুল রেখেছো, ভুরু প্লাক করা নেই। কিন্তু তোমার কান্নার আওয়াজ শুনে চিনতে পারলুম। তুমি এখানে কবে এসেছো ?

রোহিলা লোকটির চোখ থেকে চোখ না সরিয়ে আবার বললো, আপনার ভুল হয়েছে। আমি রোহিলা !

লোকটি জোর দিয়ে বললো, এখন তুমি যে-নামই নাও, তুমি সুলোচনা, আমি ঠিক চিনেছি। একদিন আমার ঘরে তুমি কত কেঁদেছিলে মনে নেই ? তুমি এখানে কেন এসেছো ?

এই লোকটি দিকশূন্যপুরের অলিখিত নিয়ম গুরুতরভাবে লঙ্ঘন করে যাচ্ছে। এখানে কেউ কারুর পুরোনো জীবনের পরিচিত হলেও প্রকাশ্যে এরকমভাবে জেরা করার প্রথা নেই। এখানে কেন এসেছো, সে প্রশ্ন তো করাই যায় না !

বন্দনাদির নেত্রী হবার সহজাত ক্ষমতা আছে। আমরা কেউ কিছু বলবার আগেই বন্দনাদি রোহিলার সামনে দাঁড়িয়ে তাকে আড়াল করে বললো, নমস্কার, আমার নাম বন্দনা। আপনার সঙ্গে আমাদের আলাপ হয়নি।

লোকটি রুক্ষভাবে বললো, তুমি একটু সরে যাও। ওর সঙ্গে আমার কথা আছে।

জয়দীপ আর বসন্ত রাও বেশ খানিকটা দূরে চলে গিয়েছিল, এখানে কিছু একটা ব্যাপার ঘটছে টের পেয়ে ওরা কাছে চলে এলো।

রোহিলা বললো, বন্দনাদি, এই লোকটিকে আমি চিনি না। আমি কি এর প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য ?

বন্দনাদি বললো, না, ইচ্ছে না করলে তুমি একটাও কথা বলো না।

তারপর বন্দনাদি লোকটির দিকে তাকিয়ে বললো, আপনি বোধহয় এখানে নতুন এসেছেন ? আপনাকে আগে দেখেছি বলে মনে হচ্ছে না।

লোকটি চেঁচিয়ে বললো, না আমি এখানে নতুন আসিনি ! বললাম না, তুমি একটু সরে দাঁড়াও, সুলোচনার সঙ্গে আমি কথা বলব।

আমি এখানকার মানুষ নই, আমার শরীরে রাগ আছে, হিংসে আছে। বন্দনাদির সঙ্গে এরকম ব্যবহার আমি সহ্য করতে পারি না। আমি বলে উঠলুম, আপনি কে মশাই ? এরকম বিশ্রীভাবে কথা বলছেন ?

বন্দনাদি বললো, তুই চুপ কর, নীলু।

তারপর আঙুল তুলে লোকটির প্রতি হুকুমের সুরে বললো, আপনি যেখানে স্নান করছিলেন সেখানে চলে যান। আপাতত আমরা ব্যস্ত আছি। আপনার যা কিছু কথা আছে, পরে বলবেন।

লোকটি আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগে জয়দীপ এগিয়ে এসে তার কাঁধে হাত রাখলো। গভীরভাবে লোকটির চোখের দিকে তাকিয়ে বললো, আপনি একটু ওদিকে আসুন, আগে আমার সঙ্গে দুএকটা কথা বলে নিন।

জয়দীপ লোকটিকে টেনে নিয়ে চলে গেল।

বসন্ত রাও মুচকি হেসে কপালে হাত ছুঁইয়ে বললো, এখনো ঠিক ভাত সেদ্ধ হয়নি, তাই হাঁড়ির ঢাকনা ঢকঢকাচ্ছে।

বন্দনাদি বললো, কিছু হয়নি। আয় আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে একটা ডুব দিই, তাতেই সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। রোহিলা, আমি তোমার হাত ধরছি।

সবাই ডুব দিয়ে ওঠার পরই বসন্ত রাও একগাল হেসে বললো, নীলুসাহেব, তুমি হেমেন মজুমদারের ছবি দেখেছো ? হায় আমি যদি ওরকম ছবি আঁকতে পারতুম !

আমি বললুম, তুমি এবারে গাছ-পালা ছাড়ো, মানুষ আঁকতে শুরু করো।

বসন্ত রাও রোহিলাকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি ছবি আঁকো, তুমি কিসের ছবি আঁকো ?

রোহিলা বললো, সে কিছু না। সে সব এলেবেলে।

আমি বললুম, রোহিলার উচিত পুরুষ মানুষের ছবি আঁকা। যুগ যুগ ধরে তো পুরুষরা মেয়েদের কতরকম ছবি এঁকেছে, কত মূর্তি গড়েছে। এখন আমরা জানতে চাই, মেয়েরা কী চোখে পুরুষদের দেখে !

বসন্ত রাও বললো, ঠিক বলেছো। ঠিক আমাদের মনের কথা বলেছো ! বন্দনা, এই ছেলেটাকে ছেড়ে দিচ্ছো কেন ? ও তো আমাদেরই লোক। ওকে এবার যেতে দিও না, ধরে রাখো !

রোহিলা বললো, নীললোহিত এখান থেকে চলে যাবে বুঝি ?

বন্দনাদি সুর করে গেয়ে উঠলো, ওকে ধরিলে তো ধরা দেবে না, ওকে দাও ছেড়ে, দাও ছেড়ে !

গানের মাঝখানে ফিরে এলো জয়দীপ। টাক মাথা লোকটি সম্পর্কে সে একটি কথাও বললো না, কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলো না !

বসন্ত রাও বললো, না, না এবার ওকে ফিরে যেতে দেওয়া হবে না, ওকে ধরেই রাখতে হবে !

এক আঁজলা জল তুলে সে আমার মাথায় ঢেলে দিয়ে বললো, এই জর্ডন নদীতে দাঁড়িয়ে আমি তোমাকে দীক্ষা দিলুম নীললোহিত, তুমি বিশুদ্ধ হও, পবিত্র হও, তুমি আমাদের হও।

রোহিলা বললো, আমিও দেবো। আমিও দেবো ! এই নাও নীললোহিত, তুমি ফিরে যাবার কথা ভুলে যাও !

বসন্ত রাও বললো, জয়দীপ, বন্দনা, তোমরাও জল ঢালো ও বেটার মাথায় ! ওকে মন্ত্র দিয়ে বেঁধে ফেলো।

তারপর ওরা সবাই মিলে জল চাপড়াতে চাপড়াতে বলতে লাগলো, নীললোহিত, তুমি থাকো থাকো, তুমি থাকো !

আমি প্রথম প্রথম হাসছিলুম। হঠাৎ কী যেন হয়ে গেল, আমি অভিভূত হয়ে পড়লুম, সত্যি যেন একটা মন্ত্র দিয়ে আমাকে বাঁধা হলো। আমার গলা ধরে গেল, আমি কোনো ক্রমে বললুম, আচ্ছা, আমি থাকবো, আমি আর ফিরে যাবো না।

জয়দীপ চেঁচিয়ে বললো, বাঃ চমৎকার। এই তো চাই !

বসন্ত রাও চেঁচিয়ে বললো, দাঁড়াও, দাঁড়াও, বাকি আছে। ও বেটার মাথা এবারে জলে ঠেসে ধরো। পুরোনো সব ময়লা ধুয়ে যাক !

ওরা ধরবার আগেই আমি ডুব দিলুম। বাল্যস্মৃতির মতন নীল জলের মধ্যে ডুব সাঁতারে চলে গেলুম অনেকটা দূরে।

॥ ১১ ॥

কী করে এখানে সব ব্যবস্থা হয়ে যায় জানি না। দুপুরবেলা আমাকে বন্দনাদির বাড়িতে বসিয়ে রেখে ওরা সবাই চলে গেল আমার জন্য বাড়ি সাজাতে। জঙ্গলের ধারে একটা খালি বাড়ি আমি আগেই দেখেছি।

শুয়ে রইলুম একলা একলা। মনটা খুব হালকা লাগছে। এ পর্যন্ত জীবনে কোনো ব্যাপারেই গুরুতর কোনো সিদ্ধান্ত নিইনি। জীবনটা যেমন চলছে চলুক, এইভাবেই দিন কাটিয়ে এসেছি। কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই, কোনো কিছুই নিজের করে পেতে চাইনি। তবে আমার কখনো কোনো কিছুর অভাবও হয় না। না পাওয়ার দুঃখ কাকে বলে এ জীবনে সেটাই বুঝলাম না।

এবারে আমার একটা নিজস্ব বাড়ি হবে। কী সুন্দর ব্যাপার, এখন থেকে আমি নিজের খাদ্য নিজেই উৎপন্ন করবো। এখানে কোনো অতীত নেই। শুধু ভবিষ্যৎ। গোটা মানবসভ্যতা, যার মাথার ওপর ঝুলছে অ্যাটম বম, তার দিকে কাঁচকলা দেখিয়ে বলবো, যাও, যাও, তোমাকে গ্রাহ্য করি না।

কাল রাতে ভালো ঘুম আসেনি, ভাবলুম এই সময়টা খানিকটা ঘুমিয়ে নেবো, কিন্তু ঘুম আসে না। শরীরে বিদ্যুৎ তরঙ্গের মতন একটা উত্তেজনা রয়ে গেছে টের পাচ্ছি।

বিছানা মানেই বই। এমন কক্ষনো হয়নি যে আমি একা একা জেগে আছি অথচ কোনো বই পড়ছি না। এখানেও আমার ঝোলাতে দুটি বই আছে, কিন্তু উঠে গিয়ে আনতে ইচ্ছে করছে না। বই ছাড়া শুয়ে থাকা, এ এক অভিনব ব্যাপার, একটা দারুণ মুক্তি।

বেগুন ক্ষেতে দুটি বুলবুলি পাখি এসে বসেছে। ডাকছে তেজী গলায়। দরজার কাছে মুখ বাড়িয়ে পাখিদুটোকে দেখতে লাগলুম। ছেলেবেলায়, তখন আমার দশ-এগারো বছর বয়েস, গ্রামে বেড়াতে গিয়ে একটা বুলবুলি পাখির বাসা আবিষ্কার করেছিলুম, দুটি নীলচে ডিম চুরি করতে গিয়ে পড়ে গিয়েছিল হাত থেকে। সে ঘটনাটা তখন মনে বিশেষ দাগ না কাটলেও ঘটনাটা ভুলিনি। কোথাও বুলবুলির ডাক শুনলেই মনে পড়ে যায়। কী নিদারুণ অপচয়। এই পৃথিবীর বাতাস দুটি বুলবুলি পাখির ডাক থেকে বঞ্চিত হলো। কোনো উপায়ে কি এটা শোধ দেওয়া যায় ?

বুলবুলি দুটো আমার দিকে পেছন ফিরে ল্যাজ দোলাচ্ছে। ওরা কি আমার পরিচয় জানে ?

বাইরে পায়ের শব্দ হচ্ছে। পাখির ডাক থেমে গেল। বন্দনাদিরা ফিরে এলো এত তাড়াতাড়ি ?

একটি অচেনা মেয়ে বারান্দা দিয়ে উঠে এসে দরজার কাছে থমকে দাঁড়ালো। বোধহয় সে ঘরেই ঢুকে আসতো, আমাকে দেখে বেশ অবাক হয়েছে।

মেয়েটির বয়েস তেইশ-চব্বিশের বেশি নয়, গায়ের রং পদ্মপাতার মতন,

মাথার চুল খোলা, ছড়িয়ে আছে পিঠের ওপর, কপালে একটা হলুদ টিপ, সে পরেও আছে একটা হলুদ রঙের শাড়ী। দুহাত দিয়ে সে একটা খরগোস ধরে আছে বুকের কাছে। খরগোশটার চোখদুটো লাল বোতামের মতন আর কানদুটো বাঁকুড়ার ঘোড়ার মতন লম্বা।

আমি তাড়াতাড়ি উঠে বসে বললুম, বন্দনাদি একটু বাইরে গেছে। খানিকটা বাদে ফিরবেন। আমার নাম নীললোহিত।

মেয়েটির চোখদুটি মনে হয় কাজলটানা। নাকটা চাপা। মনে হলো যেন সে আমার সঙ্গে কথা বলতে দ্বিধা করছে। এদিক ওদিক তাকালো, কান পেতে যেন শোনার চেষ্টা করলো, বাড়িতে আর কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছে কিনা।

তারপর সে বললো, এই খরগোশটা নিয়ে কী করি?

আশ্চর্য প্রশ্ন! একজন অপরিচিত মানুষের কাছে এরকম একটা বাক্য প্রথমে বলার কথা আমি কল্পনাও করতে পারি না।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, বন্দনাদি এই খরগোশটা চেয়েছিল বুঝি?

মেয়েটি দুদিকে মাথা নাড়লো। তারপর বললো, কাল রাত্তিরে বাগানে এসেছিল। ভালো করে দৌড়াতে পারে না।

মেয়েটি বোধহয় ঈষৎ তোতলা। থেমে থেমে কথা বলে। আমি পুরুষদের মধ্যে তোতলা আগে অনেক দেখেছি, কিন্তু মেয়ে-তোতলা তো কখনো দেখিনি। ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা বেশি দ্রুত কথা বলে। শুনেছি, জন্মের পর ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা আগে কথা বলতে শেখে।

—এটা বুনো খরগোশ? তুমি ধরেছো?

—হ্যাঁ, আমি ধরেছি। আমার নাম, পিউ।

আমার হঠাৎ হাসি পেয়ে গেল। একটু আগেই আমি বুলবুলি পাখির কথা ভাবছিলুম, তার পরেই পাখির নামে একটি তরুণী এসে উপস্থিত হলো। পিউ কাঁহা পাখি হলদে রঙের হয় না? এই মেয়েটাও হলুদ শাড়ী পরে এসেছে।

—তুমি এই খরগোশটা পুষবে?

—না। আমি কিছু পুষি না।

—তাহলে ওকে ছেড়ে দাও।

—ও যে দৌড়তে পারে না! কোথায় যাবে?

খরগোশটা মেয়েটির বুকে ছটফট করতেই সে সেটাকে আর ধরে রাখতে পারলো না। খরগোশটা মাটিতে পড়ে লাফাতে লাফাতে চলে গেল ঘরের এক কোণে।

মেয়েটি তার একটা হাত আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে করুণভাবে বললো, ও আমাকে একবার আঙুলে কামড়ে দিয়েছে। কিছু হবে?

খরগোশে কামড়ালে মানুষের কোনো ক্ষতি হয় এরকম আমি শুনিনি। মানুষকে খরগোশে কামড়েছে এরকম কোনো ঘটনাই আমার কানে আসেনি।

মেয়েটির বাড়ানো হাতটি আলতো করে ধরে আঙুলটা দেখে ডাক্তারি কায়দায় বললুম, গাঁদাফুল গাছ আছে এখানে? ঐ গাছের পাতা নিঙড়ে রস লাগিয়ে দিলে ঠিক হয়ে যাবে।

—আমি তো গাছ চিনি না!

আমি একটু চিন্তা করলুম। এখানে গাঁদাফুল গাছ দেখেছি বলে মনে পড়ে না। বন্দনাদির ঘরের জানলা দিয়ে একটা গাছের ডাল উঁকি মারে। খুব সম্ভবত আতা গাছ। উঠে জানলার কাছে গিয়ে সেই গাছের কয়েকটা পাতা ছিঁড়ে চিপড়ে বললুম, এটা লাগিয়ে দাও, এতেই কাজ হবে।

খরগোশটা ঘরের কোণে বসে জুলজুল করে দেখছে। ঘর থেকে পালাবার কোনো লক্ষণ নেই। আমি আর কয়েকটা পাতা ছিঁড়ে ওর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললুম, খা।

পিউ বললো, তুমি কে?

—ঐ যে বললুম, আমার নাম নীললোহিত। আমি নতুন এসেছি। গত কাল।

—তুমি এখানে থাকবে? বন্দনাদির সঙ্গে।

—না। আমি অন্য বাড়িতে থাকবো। জঙ্গলের ধারে। তুমি একা থাকো?

—হ্যাঁ। একা। আমার কেউ নেই।

—তুমি এখানে কবে এসেছো, পিউ!

সরাসরি এরকম প্রশ্ন করা উচিত নয়। কিন্তু মেয়েটির সঙ্গে কথাবার্তা বলতে গেলে কিছু প্রশ্ন তো করতেই হবে।

পিউ জানলার দিকে তাকিয়ে বললো, অনেকদিন। মনে নেই।

—তোমার এখানে থাকতে ভালো লাগে?

—হ্যাঁ। বোধহয়।

নাঃ, এ মেয়ের সঙ্গে আলাপ জমানো সত্যিই খুব মুশকিলের ব্যাপার। ভালো লাগে কিনা, সেটাও বোধহয়?

পিউ এ ঘর থেকে বেরিয়ে কোথায় যেন চলে গেল। দরজার কাছটা এখন খালি। তবু খরগোশটা যাচ্ছে না। থাকতে চায় তো থেকে যাক।

পিউ একটু বাদে ঘুরে এসে বললো, এই, তুমি চা বানাতে পারো ?
—হ্যাঁ, পারি।
—আমাকে, চা, খাওয়াবে ?
তাও একটা কাজ পাওয়া গেল। রান্না ঘরে গিয়ে বসলুম। দুপুরের রান্নার পর আঁচ এখনো নিভে যায়নি, আর একটা কাঠ গুঁজে দিয়ে ফুঁ দিয়ে দিয়ে ধরিয়ে ফেললুম। তারপর সসপ্যানে জল বসিয়ে দিয়ে ভাবলুম, কাল থেকে তো সব নিজেকেই করতে হবে, ট্রেনিং হয়ে যাক।
পিউ রান্নাঘরে আসেনি। ও ঘরেই রয়ে গেছে। দুকাপ চা বানিয়ে নিয়ে এসে দেখি সে মেঝেতে বসে হাঁটুতে থুতনি ঠেকিয়ে বাচ্চা মেয়ের মতন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।
—কী হলো ?
পিউ কান্না থামিয়ে আঁচলে চোখ মুছলো। তারপর বললো, কিছু না।
আমি তাকে চা-টা দিয়ে বললুম, এটা কিন্তু অন্যায়। আমি তোমাকে চা খাওয়াচ্ছি, আর তুমি আমার সঙ্গে কোনো কথাই বলবে না ? তুমি কেন কাঁদছো সেটা বলো !
এবারে সে একটুখানি হাসলো। তারপর বললো, সত্যি, কোনো কারণ, নেই। বোধহয়, আমার বুকে, অনেকখানি, কান্না, জমা হয়ে গেছে। তাই, মাঝে মাঝে, একটু একটু, খরচ করতে হয়।
আমি বললুম, লোকে যেমন টাকা পয়সায় বড় লোক হয়, তুমি তেমনি কান্নায় বড়লোক। অনেক জমা আছে বুঝি ?
—এই, তোমার, কান্না, জমা নেই ?
—নাঃ, আমি গরিব, সব ব্যাপারেই গরিব ! বারবার এই এই করছো কেন ? আমার একটা নাম আছে বললুম যে ?
—তিন-চারদিন, দেখা হলে, তারপর তো লোকে, নাম ধরে, ডাকে।
—আশা করি তোমার সঙ্গে আমার তিন চার দিনের বেশি দেখা হবে।
চায়ের কাপটা দেখিয়ে পিউ বললো, ভালো। এটা ভালো হয়েছে। আমি, একদিন, শোধ দেবো !
আমি হেসে বললুম, শোধ দিতে হবে না। বন্দনাদির চা, আমি তোমাকে খাওয়াচ্ছি।
চা-টা শেষ করার পর পিউ উঠে দাঁড়িয়ে বললো, আমি যাই ?
আমি ঘাড় নেড়ে বললুম, আচ্ছা।

পিউ খরগোশটার দিকে তাকালো, আমার দিকে তাকালো, তারপর বললো, তুমি ওকে দেখো।
বারান্দা থেকে নেমে, বেগুন ক্ষেত পেরিয়ে বাইরের রাস্তায় গিয়ে সে একবার ফিরে তাকালো। তারপর এক ঝলক হাসলো। একটু পরেই সে মিলিয়ে গেল টিলার ঢালু দিকটায়।
আমার কেমন যেন একটা অলৌকিক অনুভূতি হলো। হলুদ রঙের দুপুরবেলায় হলুদ শাড়ী পরা একটি মেয়ে এলো, তার বুকে একটা বুনো খরগোশ। সে একটুখানি কাঁদলো, এক কাপ চা খেলো, তারপর আবার অদৃশ্য হয়ে গেল। মাঝখানের ঘটনাটা কি সত্যি না আমি কল্পনা করলুম !
কিন্তু খরগোশটা রয়েছে, ও তো বাস্তব খরগোশ। শেষ মুহূর্তে ঘুরে দাঁড়িয়ে মেয়েটির ঐ হাসি ঠিক যেন একটা দুর্লভ পুরস্কারের মতন।
আমার ইচ্ছে করছিল, ও আর কিছুক্ষণ থাকুক। কিন্তু ও যখন চলে যেতে চাইলো তখন ওকে কী বলে আটকাবো তা মনে পড়লো না। খরগোশটাকে তুলে এনে আমি ছেড়ে দিলুম বারান্দায়। ওর স্বাধীনতা থাকা উচিত ঘরে কিংবা বাইরে থাকার। ওর একটা পায়ে চোট আছে ঠিকই।
এতক্ষণ বেশ ছিলুম, ঐ মেয়েটি এসে চলে যাবার পর এখন একা একা লাগছে। আমার বাড়ি সাজাবার সময় আমার সেখানে থাকা উচিত নয় বলে বন্দনাদিরা আমাকে এখানে রেখে গেছে। ওদের কতক্ষণ লাগবে কে জানে ? বাড়ি সাজাবার কী আছে ? ঝড়-বৃষ্টি থেকে মাথা বাঁচাবার জন্য একটা ছাদ থাকলেই তো হলো।
এক কাপ চা খেয়ে মেয়েটা বলে কি না শোধ দেবো ! অদ্ভুত ভাষা ! হয়তো মেয়েটি তোতলা নয়, ওর কথা বলার ধরনটাই একেবারে আলাদা।
বিকেল পর্যন্ত বারান্দাতেই ঠায় বসে বসে কাটিয়ে দিলুম। তারপর এক সময় এলো জয়দীপ। রাস্তা থেকেই হাতের ইশারা করে বললো, চলে এসো !
আমি আমার ঝোলাটা তুলে নিয়ে চটিটা পায়ে গলিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। বেশ একটা রোমাঞ্চকর অনুভূতি হচ্ছে। নিজের বাড়ি বলে কথা ! লোকে যখন বিয়ে করতে যায়, তখনো কি এরকম লাগে ?
জয়দীপ আমার আপাদমস্তক একবার দেখলো, কোনো মন্তব্য করলো না। এর মধ্যেই জয়দীপের চরিত্রটা বোঝা হয়ে গেছে। ওর যখন ইচ্ছে হবে তখন কথা বলবে, ভদ্রতা-সৌজন্যের কোনো ধার ধারবে না। মন্দ নয় ব্যাপারটা।
টিলা থেকে নামার পর জয়দীপ যেন দয়া করে বললো, তোমার বাড়িটা সুন্দর

হয়েছে, বেশ নিরিবিলি।
আমি চুপ করে রইলুম। জয়দীপকে দেখাতে হবে যে আমারও মুড আছে।
একটু দূর থেকেই দেখতে পেলুম আমার বাড়ির সামনে বেশ একটা ছোটখাটো ভিড়। কী ব্যাপার, এরা কত লোককে খবর দিয়েছে? ভাবতে ভাবতেই হাসি পেয়ে গেল। 'আমার' বাড়ি?
বাড়িটায় বেশ কিছুদিন কেউ বসবাস করেনি। সামনে আগাছা জন্মে গিয়েছিল। সেসব পরিষ্কার করা হয়েছে। দরজার চারপাশে ফুলের মালা, সামনে একটুখানি জায়গাতে আঁকা হয়েছে আলপনা। বন্দনাদি ঘুরে ঘুরে তদারকি করছে।
আমাকে দেখে প্রথমেই এক ধমক দিল, নীলু, তুই এখনো ঐ ছেঁড়া চটিদুটোর মায়া ছাড়তে পারিসনি? এখানে কেউ জুতো পরে না, দেখিসনি?
আমি লজ্জা পেয়ে চটি জোড়া খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলুম পাশের একটা ঝোপে। তারপর জিজ্ঞেস করলুম, এবারে কী করতে হবে?
বন্দনাদি বললো, এবারে এখানে ছোটোখাটো একটা নাটক হবে। তাতে তোরই মেইন পার্ট, কিন্তু তোকে কোনো ডায়লগ আগে থেকে শিখিয়ে দেওয়া হবে না।
—সে কি?
—এতে আশ্চর্য হবার কী আছে? তোকে যা জিজ্ঞেস করা হবে, তুই তার উত্তর দিবি। যা মনে আসে, তাই-ই বলবি।
—প্রত্যেকের বেলাতেই এরকম হয় বুঝি?
—নতুন যারা আসে, তাদের প্রথমে চার্চে জায়গা দেওয়া হয়। অনেকেই খুব ক্লান্ত থাকে বা বিষণ্ণ থাকে। সেইজন্য সবার বেলা এই অনুষ্ঠান হয় না। তোর বেলায় স্পেশাল কেস! তোকে যে অনেকেই এখানে আগে থেকে চেনে!
রোহিলা বললো, নীললোহিতকে একটু সাজিয়ে দিলে হয় না!
আমি বললুম, ভ্যাট, সাজাবে আবার কী?
রোহিলা বললো, জানো, আমার বেলায় কিছু হয়নি। দু'জন লোক আমাকে একটা বাড়ি দেখিয়ে দিল, আর বিড়বিড় করে কী সব উপদেশ দিল আর কিছু খাবার দিয়ে গেল। অবশ্য সেদিন আমার খুব মন খারাপ ছিল!
বন্দনাদি বললো, অনেকেই প্রথম দিন এখানে এসে খুব কাঁদে। যা নীলু, তুই এবারে ঐ আলপনার ওপরে গিয়ে দাঁড়া। তারপর সামনে যে দরজাটা বন্ধ দেখছিস, তাতে তিনবার টোকা মার। সেখান থেকেই নাটকের শুরু।

আমি চার পাশটা একবার দেখে নিলুম। যারা উপস্থিত হয়েছে তাদের মধ্যে প্রভাসদা, বসন্ত রাও আর ইসমাইল সাহেব ছাড়া আর কেউ চেনা নয়। বিজন আসেনি। বিজনকে কাল রাতের মিটিং-এ বা আজ সকালে নদীর ধারেও দেখিনি। পিউ নামের মেয়েটিকে তো আমি নিজেই নেমন্তন্ন করতে পারতুম!
আলপনার ওপর দাঁড়িয়ে দরজায় টোকা দিলুম তিনবার। সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা খুলে গেল ভিতর থেকে। একজন দীর্ঘকায় বৃদ্ধ, মুখে ধপধপে সাদা দাড়ি; খুব সম্ভবত নকল দাড়ি, মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে বললো, কে?
আমি বললুম, আমি একজন পথিক। এখানে আশ্রয় নিতে এসেছি।
যদিও সন্ধে হয়নি, তবু বৃদ্ধের হাতে একটি জ্বলন্ত মোমবাতি। সেটা বাড়িয়ে আমার মুখ দেখে জিজ্ঞেস করলো, মশায়ের কোথা থেকে আসা হচ্ছে?
—অনেক দেশ ঘুরতে ঘুরতে আসছি। সেসব জায়গার নাম মনে নেই।
বন্দনাদিরা চটাপট শব্দে হাততালি দিল। বুঝলাম যে ডায়লগ ঠিক আছে।
বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করলো, আপনাকে চেনা চেনা মনে হচ্ছে যেন। আগে কোথাও দেখেছি কি?
—চেনা তো মনে হতেই পারে। সব পথিকেরই চেহারা একরকম।
—এই মুখখানা যেন খুব চেনা। এই চোখদুটো...
—আপনার কেউ কোনোদিন হারিয়ে গিয়েছিল কি? তাহলে সে-ই আবার ফিরে এসেছে।
—ঠিক ঠিক। এসো, ভেতরে এসো!
ভেতরে পা বাড়াতে যাচ্ছি, বৃদ্ধ এক হাত তুলে বাধা দিয়ে বললো, কিন্তু একটা কথা! তুমি অতিথি, তুমি আসাতে ধন্য হয়েছি। কিন্তু তোমার আপ্যায়ন করবো কী করে? আমি বুড়ো মানুষ, আমি তো রান্না করতে পারি না।
—আমি নিজেই রান্না করে নিতে পারবো!
—সামান্য চাল-ডাল ছাড়া আর কিছু নেই।
—খিদে পেলে তা দিয়েই অমৃত বানানো যায়।
বৃদ্ধ হঠাৎ হেসে ফেললেন। তারপর মুখ তুলে বললেন, ও বন্দনা, এ যে ভালো ভালো ডায়লগ দিচ্ছে। আমি এর সঙ্গে পারছি না।
বন্দনাদি বললো, ঠিক হচ্ছে, ঠিক হচ্ছে।
বৃদ্ধ এবারে দরজার আড়াল থেকে প্রায় এক হাত লম্বা একটা লোহার চাবি তুলে নিল। তারপর নিজে বাইরে বেরিয়ে এসে সেই চাবিটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললো, ওগো অতিথি, এখন থেকে এই পুরো বাড়িটাই তোমার।

এই নাও চাবি !

আমাকে এখন ডায়ালগের নেশায় পেয়ে বসেছে। আমি চাবিটা হাতে নিয়ে বললুম, বাঃ, এ তো খুব চমৎকার। বাড়ির দরজায় কোনো তালা নেই কিন্তু মস্ত বড় চাবি আছে !

বৃদ্ধ বললেন, শরীরের অনেকগুলো দরজা আছে, তার চাবি হলো মন। শরীরটা ছোট কিন্তু মন প্রকাণ্ড, তাই না ?

কয়েকজন হাত তালি দিয়ে বললো, দারুণ, দারুণ !

একজন চেঁচিয়ে বললো, ও ভুলাভাই, তোমার কোনো অতিথি এসেছে নাকি ?

বৃদ্ধ বললো, হ্যাঁ, এসো, আলাপ করিয়ে দিই।

একজন লোক এগিয়ে এলো, বৃদ্ধ আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললো, এর নাম সুন্দররাজন, প্রতিবেশী হিসেবে অতি সজ্জন !

আমি বললুম, নমস্কার, আমার নাম নীললোহিত।

সে আমার দিকে একটি কাচের শিশি বাড়িয়ে দিয়ে বললো, স্বাগতম্ ! এটা নিন, যখন যা প্রয়োজন হবে, আমাদের বলবেন।

সেই শিশিতে রয়েছে চিনি। তারপর একজন দিল চারটে মুর্গীর ডিম। কেউ খানিকটা চাল, কেউ খানিকটা ডাল।

আমার মনটা উদ্বেল হয়ে উঠলো। পৃথিবীতে কি কোনোকালে এরকম প্রথা ছিল ? কবে থেকে লোপ পেয়ে গেল ? যার বেশি আছে, সে তো এখন আর অন্যকে তার ভাগ দেয় না ? হায় সভ্যতা !

সকলের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হবার পর বৃদ্ধ টান মেরে তার দাড়ি খুলে ফেলে বললো, আমার নাম ভুলাভাই নয়, অরবিন্দ। নাটক এখানেই শেষ। তবে, এই জিনিসগুলো কেউ ফেরত নিয়ে যাবে না। নীললোহিত, এগুলো তোমার !

আমি বললুম, কিন্তু আমি কী করে এর প্রতিদান দেবো ?

অরবিন্দ বললো, সে যখন সময় আসবে, তুমি ঠিকই অন্যকে কিছু দেবে। ও নিয়ে চিন্তা করো না। এখানে এসে তুমি সব রকম চিন্তা-মুক্ত হও ! আমাদের এখানে দু'চারটে নিয়মকানুন আছে, তা আমরা নিজেরাই ঠিক করেছি। সেসব বন্দনা তোমায় আস্তে আস্তে জানিয়ে দেবে, ব্যস্ততার কিছু নেই। আমরা এবার যাই ?

আমাদের নিজস্ব দলটা ছাড়া আর সবাই চলে গেল। শুধু বন্দনাদির পাশে

একজন অচেনা মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। হাফ প্যান্ট পরা, খালি গা। সে আমার সঙ্গে পরিচয় করতেও আসেনি।

বন্দনাদি বললো, নীলু, এর নাম সূর্যকান্ত। আমরা শুধু সূরয বলি। ও সপ্তাহে একদিন কোনো কথা বলে না ! আজ সেই-ই দিন। সেই জন্য তোর সঙ্গে আলাপ হলো না। কাল কথা হবে।

আমি লোকটিকে নমস্কার করতে করতে ভাবলুম, এ তো বড় তাজ্জব ব্যাপার। এখানে কেউ ঘড়ি ব্যবহার করে না। নিশ্চয়ই ক্যালেণ্ডারও নেই। এরা এখানে সপ্তাহ, মাসের হিসেব রাখে কী করে ? এই লোকটি কী করে ঠিক করে যে কোন্‌দিন তাকে মৌন থাকতে হবে ? দেয়ালে দাগ কেটে রাখে নাকি ?

লোকটির চোখে হাসির ঝিলিক দিচ্ছে। বোধহয় আমার মনের কথাটা বুঝতে পেরেছে। কিন্তু উত্তর দেবার তো উপায় নেই !

বন্দনাদি বললো, চল, নীলু, তোকে এবারে ভেতরটা দেখিয়ে দিই।

বাড়ির মধ্যে নিশ্চয়ই অনেক ধুলো ময়লা জমে ছিল, এখন একেবারে ধুয়ে মুছে সাফ করা। আসবাবপত্র কিছুই নেই, শুধু একটি ঘরের দেয়ালে রয়েছে একটি আলমারি। আর একটি রয়েছে বহুকালের পুরোনো ঠাকুর্দা-মার্কা ইজিচেয়ার, সেটাকে ফেলে দিলেই ভালো হয় ! রান্না ঘরে রয়েছে অতি প্রয়োজনীয় কয়েকটি জিনিসপত্র। একটি দেশলাই আর দুটো মোমবাতি। আর একটি মোমবাতি আধপোড়া ভুলাভাই ওরফে অরবিন্দ ফেলে গেছে। সেটি বোধহয় ফাউ।

বন্দনাদি বললো, এখানকার নিয়মকানুন তুই তো কিছু কিছু জানিস। বাকিগুলোও আস্তে আস্তে জেনে যাবি। এমন কিছু কড়াকড়ির ব্যাপার নেই। তবে, প্রথম দিনের নিয়মটা শুধু বলে দিই। এখানে যারা আসে, তাদের সাত দিন একা থাকতে হয়। একা মানে, সে নেহাৎ দরকার না পড়লে অন্য কারুর বাড়িতে যাবে না, অন্য বাড়িতে কিছুতেই রাত কাটাবে না। তোর যদি ভূতের ভয় থাকে, তাহলে কিন্তু তোকে কেউ তার বাড়িতেও আশ্রয় দেবে না ! তোর এখানে যে-কেউ দেখা করতে আসতে পারে, কিন্তু প্রথম সাত দিন রাত্তিরবেলা কেউ তোর সঙ্গে থাকবে না। কোনো মেয়ে তো নয়ই, কোনো পুরুষও না। অর্থাৎ আমরা সবাই একটু বাদে চলে যাবো।

মেঝেতে বসে পড়ে বন্দনাদি বললো, ওঃ, আজ সারা দুপুর বড্ড খাটুনি গেছে ! তবে আমার চেয়েও বেশি পরিশ্রম করেছে রোহিলা। এই মেয়েটা খাটতে পারে বটে !

রোহিলা বললো, কেন বন্দনাদি, জয়দীপ ? ও সাহায্য না করলে এত তাড়াতাড়ি কিছুই হতো না। শুধু এই বসন্ত রাও গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়িয়েছে !

বসন্ত রাও দুষ্টু হেসে বললো, আমি যে শিল্পী ! আমি বেশি কাজ করি না। বেশি কাজ করলে আমার আঙুল নষ্ট হয়ে যাবে !

বন্দনাদি বললো, ফাঁকিবাজের কুযুক্তি ! আর জয়দীপকে দেখো, আবার গোমড়ামুখো হয়ে আছে। গত এক ঘণ্টাতে ও একটাও শব্দ উচ্চারণ করেনি। ওর এই রোগটা কিছুতেই ছাড়ানো যাচ্ছে না। এই জয়দীপ, তুমি কী ভাবছো অত ?

জয়দীপ বন্দনাদির চোখের দিকে তাকিয়ে বললো, আমি তোমার কথাই ভাবছি, বন্দনা !

—তাই নাকি ? আমার কী সৌভাগ্য !

—বন্দনা, আজ বুঝতে পারলুম, আমি তোমাকে কতটা ভালবাসি ! আজ সকালে নদীতে দাঁড়িয়ে টাক-মাথাওয়ালা লোকটা যখন তোমার প্রতি খারাপ সুরে কথা বলছিল, তখন হঠাৎ আমার রক্ত জ্বলে উঠেছিল, মনে হয়েছিল, লোকটাকে মারি। খুব জোরে আঘাত করি। অথচ, তুমি তো জানো বন্দনা, আমি সামান্য পোকা-মাকড়ও মারতে পারি না, কষ্ট হয়। কিন্তু তোমার জন্য, শুধু তোমার জন্য আজ একটা বে-আদপ মানুষকে মারতে ইচ্ছে হয়েছিল।

বন্দনাদি আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে কৃত্রিম অনুযোগের সুরে বললো, দেখলে, দেখলে, তোমায় দেখলে ! এরকম একটা কথা আমাকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে মিষ্টি করে বলা উচিত ছিল না ওর ? ভালোবাসার কথা কেউ এত লোকের সামনে কাঠখোট্টা সুরে বলে ?

জয়দীপ বিস্ময়ের সঙ্গে বললো, কেন, একথা আড়ালে বলতে হবে কেন ?

আমরা সবাই হো-হো করে হেসে উঠলুম। রোহিলা ছাড়া। সে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রয়েছে।

বন্দনাদি জয়দীপকে জিজ্ঞেস করলে, তুমি লোকটিকে টানতে টানতে নিয়ে গেলে, সত্যি ওকে মারোনি তো ?

জয়দীপ বললো, না, মারিনি। মারার ইচ্ছে হয়েছিল।

বন্দনাদি বললো, ঐ লোকটি আমাকে কিছু অপমান করেনি, ও খারাপ ব্যবহার করেছে রোহিলার সঙ্গে। আমি লোকটির কথা অরবিন্দ আর ইসমাইল সাহেবকে বলেছি। ওরা খোঁজ খবর নেবে ! জয়দীপ, তুমি সত্যিই আজ আমাদের খুব সাহায্য করেছো !

বসন্ত রাও বললো, বন্দনা, আমিও তোমাকে খুব ভালোবাসি। কিন্তু আজ জয়দীপ এক স্টেপ এগিয়ে গেল। মনে হচ্ছে ওর সঙ্গে আমি কম্‌পিটিশনে পারবো না। তাহলে আমি এখন থেকে আমার ভালোবাসা রোহিলার ওপরেই ন্যস্ত করি।

রোহিলার পিঠে হাত দিয়ে তাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে বসন্ত রাও বললো, কী রোহিলা, তুমি আমার ভালোবাসা নেবে ? আমার ভালোবাসা কিন্তু অনেক ওজনদার, মাথা পেতে নিতে হবে !

রোহিলার চোখ চিকচিক করছে। কোনো কারণে সে এখন দুর্বল। সে আহত ভাবে বললো, ভালোবাসা নিয়ে আমার সঙ্গে ঠাট্টা করো না, বসন্ত রাও ! আমি কোনোদিন ভালোবাসা পাইনি। ভালোবাসা কাকে বলে আমি জানিই না। কিন্তু ভালোবাসা আমার খুব দরকার। যদি আমি যোগ্য না হই, আমাকে যোগ্য হয়ে ওঠার সময় দাও ! তোমরা অনেক ভালোবেসেছো, তোমরা অনেক কিছু জানো।

বসন্ত রাও বললো, আমি ঠাট্টা করছি না। তোমার যত ভালোবাসা চাই সব আমি দেবো। আমার অফুরন্ত ভালোবাসা মজুত আছে। এই নীললোহিত একবার আমাকে বলেছিল, ভালোবাসা হচ্ছে বিদ্যা বা জ্ঞানের মতন, যতই করিবে দান, তত যাবে বেড়ে। ঠিক কি না ?

বন্দনাদি বললো, ওরে বাবারে, ভালোবাসা ভালোবাসা শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেল। শোনো, তোমরা ভালোবাসা শব্দটা বেশি উচ্চারণ করে পুরোনো করে দিও না !

রোহিলা বললো, তুমি ঠিক বলেছো, বন্দনাদি। ঐ শব্দটা শুনলেই বুক চমকে উঠবে, তবে না ?

বন্দনাদি বললো, শোনো, একটা কাজের কথা বলি। আমরা আজ সারা দুপুর-বিকেল নীলুর জন্য অনেক খাটাখাটনি করেছি। আজ আর বাড়ি ফিরে রান্না করার উৎসাহ নেই। আজ নীলুর আমাদের রেঁধে খাওয়ানো উচিত না ? আমরাই আজ ওর বাড়িতে অতিথি !

বসন্ত রাও বললো, হিয়ার ! হিয়ার ! অতি মহত্ত্বপূর্ণ প্রস্তাব ! আই সেকেণ্ড ইট !

বন্দনাদি বসন্ত রাও-কে বললো, ইস ! এদিকে শিল্পী, ওদিকে খাওয়ার ব্যাপার শুনলেই উৎসাহে একেবারে ডগোমগো !

বসন্ত রাও বললো, আরে, শিল্পীরাই তো খাওয়ার ব্যাপারটা ভালো বোঝে।

বাকি লোকরা স্রিফ পেট ভরাবার জন্য খায়। কেমন কি না! তাছাড়া এই নীলু বান্দরটা কয়েক দিনের মধ্যেই বুঝে যাবে যে শুধু নিজের জন্য রান্না করা কী বিড়ম্বনা! দু' চার দিন বাদেই তোমার-আমার বাড়িতে ঠিক খাওয়ার সময় যেয়ে ঘুরঘুর করবে। ঠিক কি না! সেইজন্যই তো বলছি, ঐ বেটা কয়েকদিন আমাদের রেঁধে খাওয়াক।

আমি বললুম, ঠিক আছে। তোমাদের আজ আমি খাওয়াবো!

বন্দনাদি বললো, আমরা কিন্তু বেশির ভাগ দিনই সাহেবদের মতন সন্ধ্যের সময়েই খেয়ে খেয়ে নিই। আজ তো এমনিতেই দেরি করা যাবে না, একটু রাত হলেই চলে যেতে হবে। নীলু, তুই ব্যবস্থা কর। আমরা ক'জন? রোহিলা, জয়দীপ, বসন্ত রাও, সূরয আর আমি। তোকে নিয়ে ছ'জন। চাল-ডাল যা পেয়েছিস কুলিয়ে যাবে। না হয় কাল আবার আমরা কিছু দিয়ে যাবো।

সূরয নামের নিঃশব্দ লোকটি দু'হাত নাড়তে লাগলো। অর্থাৎ সে যেদিন কথা বলে না, সেদিন খায়ও না। কিন্তু আড্ডার মধ্যে থাকতে ভালোবাসে। জয়দীপের কথা শুনে আমাদের সঙ্গে সে-ও শব্দ করে হেসেছিল।

বন্দনাদি বললো সূরয, তুমি খাবে না? তা হলে তুমি বাড়ি যাও। একজন অভুক্ত লোকের সামনে আমাদের মোটেই খেতে ইচ্ছে করবে না!

বন্দনাদির হুকুম শুনে হাফ-প্যাণ্ট পরা জোয়ান চেহারার সূর্যকান্ত বাধ্য ছেলের মত সুড় সুড় করে বেরিয়ে গেল। কলকাতায় থাকলে বন্দনাদি এতটা রানীগিরি করতে পারতো কি? কলকাতায় যে অনেক রানী!

আমি রান্নার উদ্‌যোগ-আয়োজনের জন্য উঠে গেলুম। কিন্তু মেয়েরা সহজাত ভাবে সেবাপরায়ণ। আমার একার রান্না করার কথা, তবু বন্দনাদি এলো, আমার উনুন ধরিয়ে দিল, রোহিলা কুটতে বসলো তরকারি। এমনকি জয়দীপও বয়ে এনে দিল এক বোঝা কাঠ।

চাল ডাল মিশিয়ে আমি যখন খিচুড়ি চাপাতে যাচ্ছি, তখন বন্দনাদি বললো, আসল জিনিসটাই কেউ দিয়ে যায়নি। যার অভাবে কোনো কিছুই খাওয়া যাবে না। নীলু, তুই কী রকম রাঁধুনি রে? তোর তো প্রথমেই মনে পড়ার কথা ছিল!

—কী? কী জিনিস?

—নুন! তোর বাড়িতে নুন আছে?

আমি জিভ কাটলুম। রোহিলা খিলখিল করে হেসে উঠলো। বন্দনাদি বললো, অতি সামান্য জিনিস বলেই কেউ দেয়নি। আমার বাড়িতে অনেক আছে, কিন্তু আমিও আনতে ভুলে গেছি। এখন কে যাবে? আমার তো যেতে

ইচ্ছে করছে না।

জয়দীপ বললো, আমি নিয়ে আসছি।

বন্দনাদি বললো, না, জয়দীপ। তুমি অনেক খেটেছো আজ। বসন্ত রাও, তুমি যাও!

বসন্ত রাও বললো, আমি অবশ্যই যেতে রাজি আছি। এ আর কী কথা! তবে, মনোরম সন্ধে হয়ে আসছে, এসময় কি একলা হাঁটতে ভালো লাগে? রোহিলা যদি আমার সঙ্গে যায়, তাহলে ভালো হয়!

বন্দনাদি জিজ্ঞেস করলো, তুমি যাবে, রোহিলা?

রোহিলা বললো, সঙ্গে যেতে হবে? হাঁ, যেতে পারি।

তরকারি কোটা ছেড়ে উঠে পড়লো রোহিলা। বসন্ত রাও-এর সঙ্গে বেরিয়ে গেল। ঠিক সেই মুহূর্তটিতে আমি তাকাইনি রোহিলার দিকে।

খিচুড়ি যখন ফুটে এসেছে, বসন্ত রাও আর রোহিলা তখনও ফেরেনি, এইরকম এক সময়ে দূরে কোথাও বেজে উঠলো মাদল। দ্রিম দ্রিম গম্ভীর ধ্বনি, শুনলে বুক কাঁপে।

॥ ১২ ॥

অতদূরে যাওয়ার কোনো দরকার ছিল না। বস্তুত মাদলের বাজনা শুনে আমাদের না-গেলেও চলতো! বন্দনাদি নিজেই বললো, আজ আর যেতে ইচ্ছে করছে না, বড্ড টায়ার্ড লাগছে, খিদেও পেয়েছে। রোজ রোজ মিটিং ভালো লাগে না। আজকের মিটিং-এ কী হলো কাল অন্যদের কাছে শুনে নিলেই হবে।

বসন্ত রাও আর রোহিলা ফিরে আসার পর নুন-টুন মিশিয়ে আমরা যখন খেতে বসেছি, তখনও মাদলের ধ্বনি পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে।

জয়দীপ বললো, এতক্ষণ যখন বাজছে, তাহলে খুবই জরুরি মিটিং বলে মনে হয়। খাওয়ার পরে একটু হাঁটা ভালো। চলো না যাই!

হাঁটতে আমারও আপত্তি নেই। দিনের বেলার গরমটা এখন কমে গেছে। পরিষ্কার আকাশ, হাওয়া দিচ্ছে মৃদু মন্দ। অন্তরীক্ষে জেগে উঠলো একটা ধাতব আওয়াজ, তারপর একটা বিমান উড়ে গেল মাথার উপর দিয়ে। অদ্ভুত বেমানান লাগলো এই ব্যাপারটা। দিকশূন্যপুরে একটা সাইকেল পর্যন্ত চলে না, অথচ সেখানেও মাথার ওপর দিয়ে প্লেন যায়, মনে হলো যেন অন্য কোনো গ্রহ থেকে

এসেছে।

বিমানের শব্দ মিলিয়ে যাবার পর আবার মাদলের শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। আমরা সেই শব্দ অনুসরণ করে হাঁটি। কেউ বিপদে পড়লে তো এতক্ষণ মাদল বাজাবে না! কালকের মিটিং-এর বাজনাও এর থেকে কম সময় বেজেছিল।

বন্দনাদির বাড়ির টিলাটার পাশ দিয়ে যেতে যেতে আমার একটা কথা মনে পড়লো। আমি বললুম, বন্দনাদি, আজ বাড়ি ফিরে যদি একটি নতুন অতিথি দেখতে পাও, তাহলে চমকে যেও না!

বন্দনাদি এখনই চমকে গিয়ে বললো, সে কি রে? আবার কোন্ নতুন অতিথি?

আমি বললুম, একটা বুনো খরগোশ। তার পায়ে একটু চোট লেগেছে বলে দৌড়তে পারছে না। রাত্তিরে বোধহয় তোমার ঘরেই শোবে।

—কোথা থেকে এলো রে ওটা?

—আজ দুপুরে পিউ নামে একটা মেয়ে এসে দিয়ে গেল।

—পিউ এসেছিল? এতক্ষণ বলিসনি কেন? তোর সঙ্গে পিউ-এর আলাপ হলো, তুই ওকে নিয়ে এলি না কেন আমাদের কাছে? নীলু, তুই যে এত বে-রসিক হয়ে গেছিস তা তো জানতুম না!

—ঠিক আলাপ হলো কোথায়? মেয়েটা কীরকম যেন কাটা কাটা কথা বলে।

—ও ঐরকমই। আমার পিউকে খুব ভালো লাগে। ও কোনো রকম নিয়মের মধ্যে পড়ে না। তবে ওকে বেশি দেখা যায় না। কোথায় যে লুকিয়ে থাকে!

বসন্ত রাও বললো, পিউ? নাম শুনিনি তো আগে। আমি মেয়েটিকে চিনতে চাই।

রোহিলা হেসে উঠে বললো, কী মজার কথা! চিনতে চাই! আমরা বলি দেখতে চাই। আগে দেখা, তার পরে তো চেনা।

বসন্ত রাও বললো, আমি সংক্ষেপে বলি!

রাস্তার বিপরীত দিক থেকে দু'জন মানুষ হেঁটে আসছে। বসন্ত রাও-এর চেনা। বসন্ত রাও এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, তোমরা কি মিটিং থেকে আসছো?

লোকদুটি আমাদের দলটিকে দেখলো। তারপর একজন নিম্ন স্বরে বললো, মিটিং নয়, জ্যোৎস্নার বাড়িতে সবাইকে ডাকছে। তোমরা যদি পারো তো কিছু ফুল নিয়ে যাও।

—নীহারদা?

—হ্যাঁ।

লোকদুটি চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জয়দীপ বললো, আমি যাবো না!

রোহিলা বললো, আমিও যাবো না!

আমরা কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলাম। মৃত্যুর বাড়িতে যাওয়ার ইচ্ছে আমারও নেই।

বন্দনাদি বললো, একজন চলে গেল, আর আজই নতুন একজন এলো আমাদের মধ্যে। প্রকৃতি সব জায়গাতেই ভারসাম্য বজায় রাখে।

বসন্ত রাও বললো, মৃত্যুতেই নীহারদা বেশি গ্লোরিফায়েড হলেন। এরপর অসুস্থ, অথর্ব হয়ে বেঁচে থাকা ওঁকে মানাতো না। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত উনি জীবনকে ভালোবেসে জীবনকে ছেড়ে চলে গেলেন।

বন্দনাদি বললো, তাহলে কী হবে, জয়দীপরা যে যেতে চাইছে না!

জয়দীপ আবার জোর দিয়ে বললো, আমি যাবো না!

বসন্ত রাও বললো, এক কাজ করা যাক। চলো, আমরা আরও খানিকটা এগোই। তারপর তোমরা এক জায়গায় অপেক্ষা করবে। আমি আর বন্দনা গিয়ে খানিকটা ফুল দিয়ে আসবো।

এখন ফুল পাওয়া যাবে কোথায়? একটা তে-মাথার মোড়ে সকাল বেলা একটা কাঠচাঁপা গাছে কিছু ফুল ফুটে থাকতে দেখেছিলাম। জয়দীপ বললো, গীর্জার বাগানে অনেক ফুল ফুটে থাকে। কিন্তু গীর্জাটা এখান থেকে উল্টো দিকে। বেশ দূর।

দু' পাশের রাস্তা দেখতে দেখতে আমরা এগোলাম। এক জায়গায় কিছু জিপসি ফুল পাওয়া গেল, তাই-ই যথেষ্ট।

আমরা একটা ফাঁকা জায়গা দেখে বসে পড়লুম, বসন্ত রাও আর বন্দনাদি চলে গেল জ্যোৎস্নার বাড়িতে।

জয়দীপ নিঃশব্দ। রোহিলা একটা গাছের শুকনো ডাল দিয়ে ছবি আঁকছে মাটিতে। আবছা আবছা অন্ধকারে ছবিটা দেখা যায় না। আমরা যেন তিন দেশের তিনটি মানুষ, পরস্পরের ভাষা জানি না।

একসঙ্গে চার-পাঁচজন লোক হেঁটে আসছে এদিকে। জ্যোৎস্নার বাড়ি থেকেই ফিরছে মনে হয়। আমাদের পাশ দিয়ে যেতে যেতে তাদের মধ্যে একজন থমকে দাঁড়ালো। তাকে দেখেই ধক্ করে উঠলো আমার বুকের ভেতরটা।

লোকটিকে দেখে আমি ভয় পাইনি। আমার আশঙ্কা হলো এবার একটা কিছু ঘটবে। এই সন্ধেবেলার শান্তি নষ্ট হবে।

এই সেই সকালের টাক-মাথা লোকটি। এক দৃষ্টিতে দেখছে রোহিলাকে। জয়দীপ চোখাচোখি করলো আমার সঙ্গে। আমার প্রতিটি স্নায়ু সজাগ। লোকটি কোনো অসভ্যতা করলে তার উচিত শিক্ষা দিতে আমরা বাধ্য। একটি নারীকে কেন্দ্র করে পুরুষ মানুষদের মারামারি অতি বিশ্রী ব্যাপার, কিন্তু অন্য কোনো উপায়ও তো নেই।

রোহিলা একবার চোখ তুলে লোকটিকে দেখলো, তারপর আবার ছবি এঁকে যেতে লাগলো এক মনে। আগের ছবিটা হাত দিয়ে মুছে দিয়ে অন্য ছবি।

লোকটি দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু কোনো কথা বলছে না। ও কিছু খারাপ ব্যবহার না করলে তো আমরা প্রতিবাদ করতে পারি না। রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা অপরাধ নয়।

একবার মনে হলো, লোকটি বোধহয় অনুতপ্ত, সকালের ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চাইতে এসেছে। সেটা হলেই তো চুকেবুকে যায়। ক্ষমা করতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু লোকটি সে কথা বলছে না কেন?

কোনো কথা না বলে লোকটি আমাদের থেকে খানিকটা দূরত্ব রেখে বসে পড়লো। এক্ষেত্রেও আমরা ওকে নিষেধ করতে পারি না। জয়দীপ সকালবেলা ওর সঙ্গে কথা বলেছিল, সে তো এখন জিজ্ঞেস করতে পারে লোকটিকে যে কী ব্যাপার? কিন্তু জয়দীপ গাম্ভীর্যের মুখোশটা খুলতে রাজি নয়।

এ তো মহাজ্বালা! একটা লোক যাকে আমরা পছন্দ করি না, সে আমাদের কাছে এসে বসে রইলো, সেও কোনো কথা বলছে না, আমরাও কোনো কথা বলছি না।

ধুলোর ওপর আঁকা ছবিটা আবার মুছে দিয়ে রোহিলা হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞেস করলো, নীললোহিত, তুমি সত্যিই তাজমহলের বারান্দায় সারা রাত শুয়েছিলে?

বুঝলুম, ও অন্য প্রসঙ্গে মন ফেরাতে চায়।

—হ্যাঁ রোহিলা, সত্যি শুয়েছিলুম একবার। আর একবার খাজুরাহো মন্দিরের চত্বরে।

—খাজুরাহো, সে তো অনেক দূর!

—হ্যাঁ, দূর মানে, সেটা নির্ভর করে কোথা থেকে। জব্বলপুর থেকে বেশি দূর নয়। তুমি খাজুরাহো দেখোনি?

—নাম শুনেছি, দেখিনি। আমি তো অনেক কিছুই দেখিনি। তুমি কি এইসব জায়গায় একলা যাও?

—একলা না গেলে কল্পনা শক্তি খোলে না। জানো, খাজুরাহো মন্দিরের

চত্বরে শুয়ে···মাঝ রাত্তিরে, সে রাতে খুব জ্যোৎস্না ছিল, হঠাৎ আমি ঘুঙুরের শব্দ শুনতে পেয়েছিলুম। এদিক তাকাই, ওদিক তাকাই কিছু দেখতে পাই না, তবু স্পষ্ট ঘুঙুরের শব্দ, যেন পাথরের মূর্তিগুলো নাচছে। আমি রাজা, চতুর্দিকে সব রাজনর্তকী!

—সত্যি না হলেও সুন্দর।

—সে রাতে আমার সত্যি মনে হয়েছিল। সঙ্গে অন্য কেউ থাকলে এটা শোনা যেত না, আমরা নিজেদের মধ্যে গল্প করতুম!

—নীললোহিত, তুমি অনেক ভালোবাসা পেয়েছো, তাই না?

—আমি ভালোবেসেছি। কতটা পেয়েছি তা জানি না।

—ভালোবাসা পেতে হলে আগে ভালোবাসতে হয়। ঠিক। ঠিকই তো। তুমি আমাকে শেখাবে কী করে ভালোবাসতে হয়?

আমি আড়চোখে লোকটির দিকে তাকালুম। তার কোনো প্রতিক্রিয়া নেই, এদিকে চেয়ে বসে আছে নিঃশব্দে। হয়তো ওকে ডেকে নিলে ও আমাদের বন্ধু হতে চাইবে। কিন্তু আমার মনের ভেতর থেকে রাগ যায়নি, ও ক্ষমা না চাইলে নিজে থেকে আমি ওকে ডাকতে পারবো না।

রাস্তা দিয়ে আরও মানুষজন যাচ্ছে। অনেকেই ফিরে ফিরে দেখছে আমাদের, কিন্তু কেউ থামছে না। মাদলটা এখনো বেজেই চলেছে খুব ঢিমে লয়ে। এখন বোঝা যায়, ওর মধ্যে একটা শোকের শব্দ আছে।

বন্দনাদি আর বসন্ত রাও ফিরে এলো একটু বাদে।

ওঃ। অসাধারণ এখানকার মানুষদের সংযম। ওরা দু'জন টাক-মাথা মানুষটিকে দেখলো, অবাক হলো, কিন্তু একটি প্রশ্নও জিজ্ঞেস করলো না। ওর উপস্থিতি অগ্রাহ্য করলো একেবারে।

বসন্ত রাও বললো, তোমরা গেলে পারতে। এমন তৃপ্ত কোনো মৃত মানুষের মুখ আমি ইহজীবনে দেখিনি। নীহারদার ঠোঁটে এখনো হাসি লেগে আছে। এটা দেখাও একটা অভিজ্ঞতা।

বন্দনাদি বললো, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জ্ঞান ছিল, কথাও বলেছেন। সব সময় জ্যোৎস্নার হাত ধরেছিলেন আর বলছিলেন, জ্যোৎস্না, তোমাকে আমি কী দিয়ে যাবো, কী দিয়ে যাবো? আমার যে কিছুই নেই, তবু তোমাকে অনেক কিছু দিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে।

আমি বললুম, বসন্ত রাও, সকালে তুমি যে কবিতাটা শোনালে, তাতেও তো এই কথাই ছিল!

বন্দনাদি বললো, জ্যোৎস্নাকে ঠিক বিধবার মতন দেখাচ্ছে। অথচ জ্যোৎস্নার সঙ্গে ওর মাত্র একদিনের সম্পর্ক। তোমারও তাই মনে হয়নি, বসন্ত রাও ?

—ঠিক বলেছো। জ্যোৎস্নাকে দেখাচ্ছিল বিধবার মতন সাদা। দ্যাখো, এক ঘণ্টা বা একদিনের ভালোবাসাও চিরকালীন হতে পারে। ব্রাউনিং-এর সেই কবিতার লাইনটা মনে পড়ে, আউট অব অল ইয়োর লাইফ, গীভ মি বাট আ সিঙ্গল মোমেণ্ট !

জয়দীপ উঠে দাঁড়িয়ে বললো, আমরা এবার যাবো ?

বন্দনাদি বললো, নীহারদা বলে গেছেন, ওঁকে পোড়ানো হবে না বা কবরও দেওয়া হবে না। নদীর জলে ডুবিয়ে দেওয়া হবে। সে ব্যবস্থা করবার অনেক লোক আছে, আমাদের আর থাকবার দরকার নেই।

টাক-মাথা লোকটিও উঠে দাঁড়িয়েছে। আমরা হাঁটতে শুরু করতেই সে হন হন করে চলে গেল উল্টো দিকে।

খানিকটা এগোবার পর বন্দনাদি জিজ্ঞেস করলো, ঐ লোকটি কি এখন রোহিলার সঙ্গে কোনো খারাপ ব্যবহার করেছে ?

আমি বন্দনাদির পিঠ ছুঁয়ে বললুম, এ কী বিস্ময়, হে দেবী, আপনারও সামান্য মানবীর মতন কৌতূহল আছে ?

বন্দনাদি বললো, একটা কথা শুনলে তোরা অবাক হয়ে যাবি। জ্যোৎস্নার বাড়িতে আমি গিয়ে দেখি ঐ লোকটা নীহারদার পা ছুঁয়ে প্রণাম করছে। অথচ নীহারদার সঙ্গে ওর নিশ্চয়ই তেমন ঘনিষ্ঠতা ছিল না। নীহারদার বাড়ি ছিল আমার বাড়ির কাছাকাছি, কিন্তু সেখানে ওকে কোনোদিন দেখিনি।

এতক্ষণের গাম্ভীর্য ভেঙে জয়দীপ বললো, সত্যি ? প্রণাম করলো নীহারদাকে ?

বন্দনাদি বললো, হ্যাঁ, আমি নিজে দেখলাম। তুমি লক্ষ্য করনি, বসন্ত রাও ?

বসন্ত রাও বললো, আমি তখন জ্যোৎস্নার সঙ্গে কথা বলছিলাম। ওকে বেরিয়ে যেতে দেখলাম যেন !

আমি বললুম, বন্দনাদি, তুমি এসে লোকটির সঙ্গে কথা বললেই তো পারতে !

বন্দনাদি বললো, আমি আশা করেছিলাম ও নিজে থেকেই কিছু বলবে। সেইজন্য কিছু বলা হলো না।

আমি বললুম, দু' পক্ষেরই না-বলার জন্য যে পৃথিবীতে কত জিনিসের মীমাংসা হয় না।

বন্দনাদি রোহিলার কাঁধে হাত রেখে বললো, কী হয়েছে তোমার, রোহিলা ? মন খারাপ লাগছে ?

রোহিলা বললো, আমার কিচ্ছু হয়নি, বন্দনাদি। আমি ঠিক আছি। ঐ লোকটির কথা আমি একটুও চিন্তা করছি না, কারণ ওকে আমার মনে নেই।

—তা হলে তো আর কোনো কথাই নেই। আমরা শুধু শুধু তবে ওর কথা ভাবছি কেন ?

একটু পর বিদায় নিয়ে চলে গেল বসন্ত রাও, তার বাড়ি অন্য দিকে। রোহিলা জিজ্ঞেস করলো, আমি কী করবো ?

বন্দনাদি বললো, তুমিও বাড়ি চলে যাও। নীহারদার কথা বারবার মনে পড়ছে, আজ আর আড্ডা জমবে না। একলা ফিরতে তোমার ভয় করবে না তো ?

রোহিলা অদ্ভুত ভাবে হেসে বললো, আমি মানুষকে ভয় পাই না ! এখানে আসার পর আমার একটুও ভয় করে না !

বন্দনাদি বললো, তবু জয়দীপ তোমাকে খানিকটা এগিয়ে দিয়ে আসুক। জয়দীপ, তুমি যাবে ওর সঙ্গে ?

জয়দীপ মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানালো।

রোহিলা আমার দিকে ফিরে বললো, সু-নিশি, নীললোহিত ! কাল দেখা হবে।

জয়দীপ বললো, কাল দেখা হবে।

ওরা বেঁকে গেল ডান দিকের রাস্তায়। আমরা একটুখানি দাঁড়িয়ে ওদের দেখলুম। জয়দীপ রোহিলার একটা হাত ধরেছে। জয়দীপ বন্দনাদির ভক্ত, অথচ বন্দনাদি কত সহজে তাকে অন্য নারীর সঙ্গে চলে যেতে দিল।

টিলার কাছে এসে বন্দনাদি বললো, তুই এখান থেকে চিনে তোর বাড়িতে যেতে পারবি, নীলু ?

আমি বললুম, কেন পারবো না ? তোমার ক্লান্ত লাগছে ? তোমাকে আর আসতে হবে না !

বন্দনাদি বললো, তুই ঠিক থাকতে পারবি তো নীলু ? প্রথম রাতটা খুব ছটফটানি লাগে। অবশ্য, তুই তো একেবারে নতুন না, তবু, সব কিছু ছেড়ে আসার চিন্তা।

—আমার কোনো অসুবিধে হবে না, বন্দনাদি !

—নীলু, তুই থেকে যেতে রাজি হলি কেন রে ?

—তোমার জন্য ! শুধু তোমার জন্য !
—তুই কী সুন্দর করে মিথ্যে কথা বলতে পারিস !
আমাকে দু' হাত মেলে জড়িয়ে ধরে গালে গাল ঠেকালো বন্দনাদি। আস্তে আস্তে বললো, আজ রাত্তিরটা লক্ষ্মীছেলের মতন ঘুমিয়ে থাক। কাল তোকে একটা চুমু দেবো। কাল সকালে আমি তোর বাড়িতে চা খেতে যাবো"!

॥ ১৩ ॥

বাড়িতে এসে আমি প্রথমেই একটা সিগারেট ধরালুম। সব নিয়মকানুন যে মানতে হবে তার কোনো মানে নেই। এটা আমার নিজের বাড়ি, এই চৌহদ্দির মধ্যে শুধু আমার নিয়মের রাজত্ব।

এখানে কোনো যান-বাহন নেই বলেই কি জায়গাটা এত বেশি নিঃশব্দ ? এই বাড়ির কাছাকাছি আর কোনো বাড়ি নেই, দূরে কোনো বাড়ির আলোও দেখা যায় না।

অনেক ডাকবাংলোতে আমি একা একা রাত কাটিয়েছি। মানসের জঙ্গলে সেই রাত, কী নিদারুণ নিঃসঙ্গ ছিল ! একা থাকার একটা রোমাঞ্চ আছে, সেটা আমি বেশ উপভোগ করি। কিন্তু এখন কী রকম যেন একটা অস্বস্তির ভাব, একটা কিসের যেন চাঞ্চল্য টের পাচ্ছি নিজের মধ্যে। এটা আমার নিজের বাড়ি। এখানে আমি সারা জীবন থাকবো ?

রান্না ঘরে গিয়ে একটা মোমবাতি জ্বাললুম। এঁটো থালা-বাসনগুলো পড়ে আছে, কাল সকালে মাজতে হবে। বিলেত-আমেরিকায় যে-সব ছেলেরা যায়, তাদেরও তো ঘর ঝাঁট দিতে হয়, থালা বাসন মাজতে হয় !

মোম নিয়ে সারা বাড়িটা ঘুরে দেখলুম। খাট-বিছানা কিছু নেই। তাতে কী হয়েছে ? আজকাল ডাক্তাররা নাকি বলেন, বালিশহীন শক্ত বিছানায় শোওয়াই স্বাস্থ্যকর। তাছাড়া ইজি চেয়ারটা রয়েছে।

সিগারেটটা বেশ তারিয়ে তারিয়ে শেষ করলুম। তারপর ঝোলা থেকে বার করলুম আমার যাবতীয় সম্পত্তি। কয়েকটি জামা-প্যান্ট, পায়জামা, দু'খানা বই, একটা খাতা, কলম, দু' প্যাকেট সিগারেট, একটা ছোট ছুরি, এক পাতা সেফটিপিন, ছোট একটা ব্র্যাণ্ডির শিশি—এই সব আমার ভ্রমণ-সঙ্গী।

প্রথমে সিগারেটের প্যাকেট দুটো ছুঁড়ে ফেলে দিলুম জানলা দিয়ে।

নিয়ম-ভাঙা হয়ে গেল, আর সিগারেট দরকার নেই।

ফেলে দেবার পর মনে মনে হাসলুম। এরকম অনেকবার হয়েছে, আর সিগারেট খাবো না ভেবে প্যাকেট ছুঁড়ে ফেলে দিয়েও একটু বাদে আবার কুড়িয়ে এনেছি, এমনকি পোড়া টুকরো খুঁজে এনেছি মাটি থেকে। সুতরাং ঐ প্যাকেটদুটোর চিরতরে গতি করা দরকার।

এক গেলাস জল নিয়ে চলে এলাম বাইরে। জানলার বাইরে ফাঁকা মাটিতে প্যাকেটদুটো পাশাপাশি পড়ে আছে। তার ওপরে ঢেলে দিলুম জল। বিদায় সিগারেট ! অনেক বছরের বন্ধু ছিলে, অনেক দুঃখে-সংকটে তুমি আমায় সাহায্য করেছো, ভরসা দিয়েছো, অনেক আনন্দ দিয়েছো, এবার থেকে তোমার সঙ্গে সব সম্পর্কের ইতি। তুমি সভ্যতার অগ্রগতির অঙ্গ। আমি এখন সভ্যতার আওতার বাইরে।

সিগারেট ফুরিয়ে গেলে সেই যে পাগলের মতন খোঁজাখুঁজি, এবার সেই পাগলামি থেকেও নিষ্কৃতি ! বেশ একটা মুক্তির স্বাদ পাওয়া গেল !

ঘরে ফিরে এসে খাতা আর কলমের দিকে তাকিয়ে রইলুম কিছুক্ষণ। ও দুটো রাখারই বা কী দরকার ? অতিরিক্ত আবর্জনা ছাড়া আর তো কিছু না ! কলম আমার আর কোন্ কাজে লাগবে ?

পেছন দিকের বাগানে এসে খুব জোরে ছুঁড়ে মারলুম কলমটাকে। ওদিকে একটা ডোবা মতন আছে। আমার কলমের সলিলসমাধি হওয়াই ভালো। এবারে খাতাটাকেও পাঠালুম সেই দিকে।

এবারে বই দুটো ?

বই দুটোর মালিক আমি নই, ধার করে নিয়ে এসেছি। ঐ বই-এর মালিককে আর কোনোদিনই ফেরৎ দেওয়া হবে না বটে, তবু পরের জিনিস ফেলে দিতে আমার হাত ওঠে না ! আর কিছু না হোক, উনুন ধরাবার জন্যও ঐ বই-এর পাতা ছিঁড়ে কাজে লাগানো যেতে পারে। বই দুটি রেখে দিলুম রান্না ঘরে।

ব্রান্ডির শিশিটা ? ঠিক নেশার জন্য তো ওটা রাখিনি, হঠাৎ শরীর খারাপ হলে কিংবা খুব শীত করলে ওটা কাজে লাগে। নেশার দ্রব্য হলে তো জমিয়ে না রেখে আগেই খেয়ে ফেলতুম। ওটা রেখে দেওয়া হবে না ফেলে দেওয়া উচিত ? ঠিক মত মন ঠিক করতে পারি না।

একটুবাদে একটা উপায় মাথায় আসে। ছিপিটা খুব শক্ত করে এঁটে শিশিটা নিয়ে চলে এলুম বাগানে। ক'দিনের বৃষ্টিতে মাটি বেশ নরম হয়ে আছে, খালি হাতেই অনেকটা খুঁড়ে ফেলা গেল। তারপর ব্র্যান্ডির শিশিটাকেসেই গর্তে কবর

দিলাম। জয়দীপ যদি তার ঘড়ি পুঁতে রাখতে পারে তা হলে আমিই বা ব্র্যান্ডির শিশি সেই ভাবে রাখতে পারবো না কেন ? পরে অন্য কারুর উপকারে লেগে যেতে পারে।

এবারে আমি প্রকৃত স্বাধীন। মোমবাতি নিবিয়ে জামা-কাপড়ও খুলে ফেললুম। গ্রীষ্মকালে, একলা নিজের বাড়িতে উলঙ্গ হয়ে শুয়ে থাকতেও তো অসুবিধে কিছু নেই। ঘরে না শুয়ে যদি উন্মুক্ত মাঠে শুই তা হলে একেবারে সাড়ে সাত লক্ষ বছর আগেকার পৃথিবীতে চলে যাওয়া যায়।

কিন্তু বর্ষাকাল, সাপের ভয় আছে। এই বাড়িটা অনেকদিন অব্যবহৃত ছিল, আশেপাশে সাপ-খোপ থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। সন্ধেবেলা আমি একটা ধেড়ে ইঁদুর দেখেছি।

থাক, এক লাফে সাড়ে সাত লক্ষ বছর পিছিয়ে যাবার দরকার নেই, তিন-চার হাজার বছরই যথেষ্ট। ঘরেই শোবো ঠিক করলুম।

চোখ একেবারে খরখরে শুকনো। সহজে ঘুম আসবে বলে মনে হয় না।

টাক-মাথা লোকটার কথা মনে পড়লো হঠাৎ, ও রোহিলাকে হঠাৎ সুলোচনা বলে ডেকে উঠলো ! রোহিলার সঙ্গে ওর কী সম্পর্ক ছিল, এখানে এসেও সেটা ভুলতে পারছে না ? রোহিলা কিন্তু আগাগোড়া অবিচলিত। এই মেয়েটি সত্যিই অসাধারণ !

—নীলু ! নীলু !

কে ডাকছে আমাকে। ধড়মড় করে উঠে পায়জামাটা পরে নিলুম। ডাকটা থেমে গেছে। তবু আমি উঁকি মারলুম বাইরে। কেউ নেই। পুরুষের গলা, ঠিক চিনতে পারিনি।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, কে ? কেউ আছো ওখানে ?

কোনো উত্তর নেই। একটুক্ষণ অপেক্ষা করেও কোনো স্পন্দন টের পেলুম না। তাহলে কি আমার শোনার ভুল ? কোনো রাতপাখি ডেকে উঠেছিল ?

ফিরে এসে শুয়ে পড়লুম আবার। ডাকটা শুনে আমার বুকটা কেঁপে উঠেছিল। কেন, কিসের ভয় আমার ? খুব ঘনিষ্ঠ কেউ না হলে তো নীলু বলে ডাকবে না, এখানে সেরকম পুরুষ কে আছে ?

আবার একটু পরেই স্পষ্ট শুনতে পেলুম সেই ডাক। কণ্ঠস্বরে একটা ব্যাকুলতা রয়েছে। কেউ যেন হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলছে, নীলু, নীলু, এদিকে আয় !

এবারে আমি উঠে খুঁজতে গেলুম না। আমার শরীর শিরশির করছে। আবার

সেই ডাক শোনার জন্য উদগ্রীব হয়ে রইলুম।

যদিও অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না, তবু আমি চোখ বুজলুম। যে ডাকছে তার মুখখানা যদি চেনা যায়। কিন্তু অস্পষ্ট রেখা ঠিক চেনা যাচ্ছে না।

তারপরেই হঠাৎ এক ঝলক হলুদ আলোর মধ্যে দেখা গেল দুটি মেয়েলি হাত, কেউ বললো, নীললোহিত, তুমি আসবে না ?

আমি উঠে বসলুম। প্রথম রাত্রে এইরকম হয় ? তাহলে ঘুমোবার চেষ্টা না করাই তো ভালো ! একা একা মানুষ কী করে জেগে থাকে ? বই দুটো নিয়ে এসে পড়বো মোম জ্বেলে। হাতের আঙুল নিশপিশ করে উঠলো অমনি। রাত জেগে বই পড়ার সময় সিগারেট খাবো না, এটা যেন চিন্তাই করা যায় না। সিগারেটগুলোকে নিজের হাতে ধ্বংস করেছি। সব কটাই ভিজে গেছে ? একটা দুটো যদি উদ্ধার করা যায়…কিংবা ব্র্যান্ডিতে দু' এক চুমুক দিলে যদি ঘুম আসে…

নিজের মনেই হাসলুম। প্রথম রাত্তিরে সবারই কি মাথায় এই রকম চিন্তা আসে ? কাল বন্দনাদিকে জিজ্ঞেস করতে হবে তো ! পিছুটান এত তীব্র ?

খর-র-র খ-র-র-র শব্দ হলো বাইরে। এটা সত্যিকারের শব্দ, আমি বানাইনি ! কান পেতে আরও দু' একবার শুনলুম। কোনো সন্দেহ নেই, একটা জীবন্ত কিছু উপস্থিত হয়েছে।

বাগানে এসে দেখি, শব্দটা আসছে আমার রান্নাঘরের ছাদ থেকে। একটা কোনো পাখি এসে বসেছে। ভালো করে নজর করলুম। সাদা রঙের একটা প্যাঁচা। তার মানে লক্ষ্মী প্যাঁচা ? আমার মতন এক লক্ষ্মীছাড়ার বাড়িতে ?

অল্প অল্প জ্যোৎস্নায় দুধ-সাদা রঙের প্যাঁচাটিকে বড় সুন্দর দেখায়। বিস্ময়মাখা বড় বড় চোখ, ঠিক মানুষের মতন।

আমি একটু কাছে এগিয়ে যেতেই সেই প্যাঁচা আমায় স্পষ্ট ভাষায় জিজ্ঞেস করলো, তুমি কে ?

আমি বিনীতভাবে বললুম, আমি নীললোহিত, এখানে নতুন অতিথি হয়ে এসেছি।

প্যাঁচাটি মাথা নেড়ে বললো, তোমার নাম জানতে চাইনি, প্রকৃত পরিচয় দাও। তুমি কে ?

—আমি একজন মানুষ। আর তো কিছু পরিচয় নেই।

—তুমি নিজের পরিচয় জানো না। তুমি কী চাও ?

—আমি কী চাই ? তাও তো জানি না !

—তোমার জীবন কার জন্য ?

—আমার জীবন কার জন্য ? তার মানে ?

—তুমি আমার প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করো না। উত্তর দাও ?

—জানি না।

—তুমি কেন এখানে থাকতে চাও ?

বন্দনাদি যখন এই প্রশ্নটা করেছিল, আমি তৎক্ষণাৎ বলেছিলাম, তোমার জন্য। সেই মুহূর্তে ঐ উত্তরটাই মানায় এবং সেটা সেই মুহূর্তের সত্যও বটে। কিন্তু এই নিশি-বিহঙ্গকে আমি কোন্ উত্তর দেবো ?

আমাকে নীরব থাকতে দেখে সেই শুভ্র পাখি তার দুই ডানা বিস্তার করলো। ঈষৎ কঠোরভাবে বললো, তোমাকে আমি আর একটি মাত্র প্রশ্ন করবো। তার সঠিক উত্তর দিতে না পারলে তোমার স্মৃতিলোপ ঘটবে। তুমি পুরোনো সব কথা ভুলে যাবে। আর যদি উত্তর দিতে পারো ...

আমি ভয়ে কেঁপে উঠলুম। বিষাক্ত এক পুষ্করিণীর পাশে এক বক যুধিষ্ঠিরকে অনেক প্রশ্ন করেছিল। এই প্যাঁচাও কি ছদ্মবেশী কোনো দণ্ডদাতা ? কিন্তু আমি কি যুধিষ্ঠির নাকি যে শক্ত শক্ত দার্শনিক প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবো ?

আমি বললুম, না, না, না, আমাকে আর প্রশ্ন করবেন না। আমি স্মৃতি হারাতে চাই না। আমি হার স্বীকার করছি।

—তাহলে তুমি এখানে থাকার যোগ্য নও !

এরপর আমার মাথার ওপর দিয়েই উড়াল দিয়ে সেই প্যাঁচা চলে গেল পশ্চিম দিগন্তের দিকে।

একটুক্ষণ সেখানেই মূর্তির মতন নিথরভাবে দাঁড়িয়ে থাকার পর আমি শুনতে পেলুম ট্রেনের চাকার শব্দ, হকারদের চিৎকার, কফি হাউসের গমগমে আওয়াজ। আমার নাকে এলো ডাব্‌ল ডেকার বাসের পোড়া ডিজেলের গন্ধ, মানুষের ভিড়ের গন্ধ, খুব চেনা কোনো হাতের গন্ধ। একটু দূরেই কারা যেন দাঁড়িয়ে আছে, হাতছানি দিচ্ছে।

আমি একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললুম। সাদা প্যাঁচা তাহলে আমার স্মৃতি লোপ করে দেয়নি। আমি ভুলতে চাই না।

যারা আগেকার স্মৃতি ভুলতে চায়, তারাই তো এখানে আসে। প্যাঁচা ঠিকই বলেছে, আমি এখানে থাকার যোগ্য নই। এতদিন মাঝে মাঝেই স্বপ্ন দেখতাম, কোনো একদিন দিকশূন্যপুরে যাবো। এখানে পাকাপাকি পৌঁছে গেলে আর কোথায় যাবার স্বপ্ন দেখবো ? যদি এখানে থাকতে ভালো না লাগে তাহলে যে দিকশূন্যপুর চিরকালের মতন হারিয়ে যাবে !

বন্দনাদি বলেছিল, প্রথম রাতটাই খুব কঠিন। প্রথম রাতেই এই সব দ্বিধা মনটাকে দুর্বল করে দেয় ?

আকাশের দিকে তাকিয়ে কত রাত বোঝা যায় না। দু-একটা তারা দেখা যাচ্ছে। হাউইয়ের মতন কী যেন একটা ছুটে গেল নিঃশব্দে। এইমাত্র একটা নক্ষত্রপাত হলো ? আমার বুকের ভেতরটা সমুদ্রের মতন তোলপাড় হচ্ছে, কিন্তু আমি আকাশের মতন শান্ত হতে চাইছি।

মোম জ্বেলে বাসনপত্রগুলো মেজে ফেললুম। কাজ গুছিয়ে রাখা ভালো। জল প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। এখন কুয়ো থেকে জল আনতে গেলে কেমন হয় ?

আমার জীবনটা কার জন্য ? আমি কী চাই ? কোনোদিন এই প্রশ্ন আমার মনে জাগেনি। কারুর প্রতি আমার রাগ বা অভিমান নেই। তবে আমি কেন এখান থেকে যেতে চাই ? ঐ প্যাঁচা কাল আবার ফিরে আসবে, আবার প্রশ্ন করবে !

আগে এই সব প্রশ্নের উত্তর জানা দরকার। তাড়াতাড়ি আমার জিনিসপত্রগুলো গুছিয়ে নিলুম থলিতে। রান্নাঘরের তাক থেকে পেড়ে নিলুম বই দুটো। খাতা আর কলম উদ্ধার করা যাবে না। ব্র্যাণ্ডির শিশিটাও আমি ভূমিকে দান করেছি।

বাইরে বেরিয়ে খানিকটা খুঁজতেই চটি দুটো খুঁজে পাওয়া গেল ঝোপের মধ্যে। সে দুটোকে ভরে নিলুম থলের মধ্যে, পরে কাজে লাগবে। কারুকে কিছু জানিয়ে যাবার দরকার নেই, তাছাড়া রাত্রে কারুর বাড়িতে যাওয়া নিষেধ। যার বাড়িতে যাবো, সে-ই ভাববে আমি ভূতের ভয় পেয়ে চলে এসেছি। এক হিসেবে মিথ্যে নয়, ভূতের টানেই চলে যাচ্ছি আমি। বন্দনাদি ঠিকই বুঝবে।

সাধারণভাবে হেঁটে যাবার বদলে আমি ছুটছি কেন ? কে আমাকে টানছে ! খেয়াল হবার পর আমি গতি কমালুম। এত ব্যস্ততা নেই তো কিছুর। রাত অনেক বাকি। তাছাড়া কারুর সঙ্গে দেখা হলেও ক্ষতি নেই, কেউ তো আমায় বাধা দেবে না।

বন্দনাদির বাড়ির টিলার পাশে থমকে দাঁড়ালুম। বন্দনাদি কাল একটা চুমু দেবে বলেছিল। সে কথাটা মনে হতেই যেন এলাচের গন্ধ পেলুম। সেই গন্ধটা বাতাসে ভাসতে লাগলো। রাত্রির আকাশ যেন বন্দনাদির চুম্বন। থাক। পাওনা রইলো। না-পাওয়া চুমুর আকর্ষণ অনেক বেশি।

এক দৌড়ে এই টিলার ওপরে উঠে গিয়ে আমি বন্দনাদির বুকে মাথা রাখতে পারি। তার বদলে আমি নদীর দিকে হাঁটতে লাগলুম। কেন ? আমি কী চাই তা

আমি জানি না।

কাল বোধহয় এই সময়েই বন্দনাদি একটার পর একটা গান গাইছিল। আজ সবাই সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়েছে। দেরি করে জ্যোৎস্না ফুটেছে আজ, তা কেউ দেখলো না। জ্যোৎস্না ··· বন্দনাদি বলেছিল, জ্যোৎস্নাকে ঠিক বিধবার মতন দেখাচ্ছে। কী করছে এখন জ্যোৎস্না ? সে-ও কি ঘুমিয়েছে ? জ্যোৎস্নার মুখটা আমার ভালো করে দেখার ইচ্ছে ছিল। এখন আর যাওয়া যায় না। সম্ভবত নীহারদার দেহ এখনো সেখানে রয়ে গেছে।

নদীর ধারে এসে আমি একটা সুবিধেমতন জায়গা খুঁজতে লাগলুম। নদীটা কোথাও বেশী চওড়া ও গভীর, কোথাও খানিকটা রোগা। তবু যা মনে হচ্ছে, সাঁতার কাটতেই হবে।

পাজামা-পাঞ্জাবি খুলে ফেলতে যাচ্ছি, এমন সময় হঠাৎ একটা ঠক ঠক শব্দ শুনতে পেলুম। সঙ্গে সঙ্গে আবার পোশাক পরে নিতে হলো। জনমানবের চিহ্ন নেই, তাহলে কিসের শব্দ। অনেকটা কাঠঠোকরার আওয়াজের মতন। ঠক ঠক ঠক ! ঠক ঠক ঠক !

আওয়াজটা অনুসরণ করে এগিয়ে গেলুম। একটা বড় পাথরের আড়াল থেকে শব্দটা আসছে। কেমন যেন অলৌকিক লাগছে। এটা কোনো প্যাখির ব্যাপার নয়।

খুব সন্তর্পণে পাথরের আড়াল থেকে একটুখানি মুখ বাড়িয়ে দেখে দারুণ চমকে উঠলুম। ছায়ার মতন একটা মূর্তি, অন্ধকারের মধ্যে অনেকখানি মিশে আছে। মনে হয় মানুষ নয়। পরক্ষণেই বুঝতে পারলুম, এ তো রোহিলা, এখন আবার কালো শাড়ীটা পরে এসেছে !

একটা ছেনির মতন জিনিস পাথরের খণ্ড দিয়ে ঠুকছে রোহিলা। তা দেখেই মনে পড়ে গেল, আসবার সময় এখানকার একটা বড় পাথরের চাঁইতে একটা অসমাপ্ত রিলিফ ছবি দেখেছিলাম। ওটা তাহলে রোহিলারই কীর্তি ? একবারও ওটার কথা উল্লেখ করেনি।

হঠাৎ ওকে চমকে দেবার বদলে প্রথমে মাটিতে পা ঘষে একটা ছোট আওয়াজ করলুম। রোহিলা মুখ ফিরিয়ে তাকাতেই আমি বললুম, রোহিলা, আমি নীললোহিত !

কাজ থামিয়ে রোহিলা বললো, তুমি ! ঘুম আসছে না বুঝি ? প্রথম রাতে ঘুম আসে না, আমিও ঘুমোতে পারিনি।

কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলুম, তুমি এত রাতে ছবি আঁকছো ? কিংবা

এটা ভাস্কর্য ?

রোহিলা বললো, সে রকম কিছুই না ! এই পাথরটার গা কীরকম মসৃণ দেখো ! এরকম পাওয়াই যায় না। এটা দেখেই মনে হয়েছিল, এটার গায়ে একটা ছবি হলে মানাবে। তাই একটু চেষ্টা করছি !

—এত রাত্তিরে কেন ?

—দিনের বেলা লজ্জা করবে না ? আমি কী ছবি আঁকতে জানি ? সবাই এসে দেখবে। বলবে, ঠিক হচ্ছে না। কেউ বলবে মুখটা ওপরের দিকে তুলে দাও। কেউ বলবে চিবুকটা ধারালো করো ! তার চেয়ে রাত্তিরেই সুবিধে ! নীললোহিত, তুমি কিন্তু কারুকে বলবে না যে এটা আমার !

—আচ্ছা বলবো না।

—তুমি কী করে এখানে এলে, নীললোহিত ? অনেক দূর থেকে শব্দটা শোনা যায় বুঝি ?

—না, আমি কাছাকাছি এসে শুনতে পেলাম !

—একটা হাতুড়ি পেলে বড্ড সুবিধে হতো ! পাথর দিয়ে ঠুকে ঠুকে ঠিক হয় না। তুমি আমাকে একটা হাতুড়ি বানিয়ে দেবে ?

—আমি ? আমি হয়তো পারবো না, রোহিলা। তুমি বরং বসন্ত রাও-কে বলো, ওর কাছে থাকতেও পারে !

—না, আমি ওকে বলবো না। তুমি তৈরি করে দেবে না কেন, নীললোহিত ? তুমি তো খুব খারাপ লোক।

আমি চুপ করে রইলুম। রোহিলা ছেনিটা কোমরে গুঁজে নিয়ে বললো, চলো, জলের ধারে বসি, তোমার সঙ্গে গল্প করি। এখানকার রাতগুলো বড় সুন্দর, আমার ঘুমোতে ইচ্ছে করে না।

কয়েক পা এগোবার পর রোহিলা জিজ্ঞেস করলো, এ কী, তোমার কাঁধে ব্যাগ কেন ?

নিজে থেকে বলতে পারছিলুম না, ও জিজ্ঞেস করাতে সুবিধে হলো। আমি রোহিলার হাত ছুঁয়ে বললুম, রোহিলা, আমি চলে যাচ্ছি।

যেন একটা অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখছে এই ভাবে রোহিলা আমার মুখের দিকে তাকালো। তারপর আস্তে আস্তে বললো, চলে যাচ্ছো ? আজ রাতেই ? নীললোহিত, প্রথম রাতে এরকম হয়। আমি খুব কেঁদেছিলুম। দুতিন দিন থাকো !

আমি বললুম, তুমি এখানে কেন এসেছো, তা তুমি জানো। কিন্তু আমি যে

সেটা জানি না !

রোহিলা বললো, এখানে কেউ কারুকে কোনো ব্যাপারে বাধা দেয় না, তাই না ? আমারও তোমাকে বাধা দেওয়া উচিত নয় ! কিন্তু, তুমি চলে যাচ্ছো, সেই সময় কেন আমার সঙ্গে দেখা হলো ? আমার যে মনটা খুব খারাপ লাগছে ! এখন আমি কী করি ?

—আমি পরে আবার আসবো, রোহিলা !

—আবার আসবে, তবে কেন চলে যাচ্ছো ? ও, থাক, উত্তর দিতে হবে না। এখানে এসব কৌতূহল দেখাতে নেই। তুমি আবার একদিন তাজমহলের বারান্দায় গিয়ে শোবে একা একা ?

—কী জানি ! হতেও পারে।

—তাজমহল, খাজুরাহো মন্দিরে আমার কোনোদিন শোওয়া হলো না।

—তাতে কী হয়েছে, ওসব জায়গা মনে মনে কল্পনা করে নিলেই হয় ! রোহিলা আমার দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলো। রাত্তিরবেলা কালো রঙের শাড়ীতে ওকে বে-মানান লাগছে না। মনে হয় যেন অন্ধকারের মাধুরী।

আমি খুব আস্তে আস্তে বললুম, রোহিলা, আমি এবার যাই ?

—নীললোহিত, তুমি আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে যাবে ?

—কোথায় ?

—ভয় নেই, তোমার সঙ্গে তোমার বাড়িতে যাবো না। আমি আর কোনো বাড়িতেই যাবো না। তুমি আমাকে তাজমহল কিংবা খাজুরাহোতে পৌঁছে দেবে ?

—তা দিতে পারি। কিন্তু তারপর সেখান থেকে কোথায় যাবে ?

—সে তোমাকে ভাবতে হবে না ! আমি যে অনেক কিছু দেখিনি, তাই আমার কল্পনাশক্তি এত কম। এত ছোট জীবন নিয়ে আমি কী করে বাঁচবো ? তাই দেখতে ইচ্ছে করে .... তুমি আমাকে নিয়ে যাবে না ?

—কেন নিয়ে যাবো না, চলো !

নদীর জলে একটুখানি নেমে এলো রোহিলা। আমার হাত ধরলো। আমি জিজ্ঞেস করলুম, তুমি সত্যিই যেতে চাও ? তোমার তো এখানে ভালো লাগছিল।

রোহিলা বললো, আবার ওপারে গিয়ে দেখি এখানে ফিরে আসতে ইচ্ছে করে কি না ?

হাঁটু জলে আসবার পর রোহিলা আমার হাত শক্ত করে ধরে বললো, নীললোহিত, আমার ভয় করছে। আমি যে সাঁতার জানি না !

—ভয় নেই। আমাকে ধরে থাকো। ডুব জল হলে আমি তোমার কোমর ধরে ভাসিয়ে নিয়ে যাবো।

—তুমি ভালো সাঁতার জানো ?

—তোমাকে নিয়ে যেতে পারবো ঠিকই।

—আমি অন্যদিক থেকে এসেছিলাম এখানে। সেখানে নদী ছিল না, পাহাড় ছিল। পাহাড় পেরিয়ে যাওয়া সহজ। সেই দিক দিয়ে চলো।

—সেদিক দিয়ে তুমি তো একাই যেতে পারবে। আমার সাহায্য লাগবে না। রোহিলা, আমাকে এইদিক দিয়েই যেতে হবে।

কোমর জল এসে গেছে। রোহিলা দাঁড়িয়ে পড়ে বললো, নীললোহিত, তুমি আমাকে নিয়ে যেতে চাও না ?

—কেন চাইবো না। এসো—

—না। আমি যাবো না। যেতে পারবো না, তুমি ফিরে এসো। নীললোহিত, তুমি ফিরে এসো !

আমি রোহিলার হাত ধরে টানলুম, রোহিলা আমাকে টানল বিপরীত দিকে। আমরা একই জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। পল-অনুপল-মুহূর্ত কেটে যেতে লাগলো। জোনাকির মতন ঝরে ঝরে পড়ছে জ্যোৎস্না। নদীর ওপার থেকে বাতাস এসে মাথার ওপর খেলা করছে।

দূরে কয়েকজনের কণ্ঠস্বর শোনা গেল হঠাৎ। কারা যেন আসছে। বোধহয় নীহারদাকে নিয়ে আসছে সমাধি দিতে।

রোহিলার কাছ থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে আমি নেমে গেলুম গভীরতর জলে।

—

সবিনয়ে নিবেদন

হাঁটি হাঁটি পা পা করে আজ এই লাইব্রেরিটি ৫ম মাসে পদার্পন করল। বইয়ের সংখ্যাও ২০০ অতিক্রম করেছে। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে এই সাইটের জন্মলগ্ন থেকেই শুভানুধ্যায়ীর অভাব ছিল না। তাদের প্রবল উৎসাহ আমাকে প্রবলবাবে অনুপ্রাণিত করেছে। আমি কঠিন আর্থিক অনটনের মধ্যদিয়ে সময়টা অতিক্রম করছি,কিন্তু পাঠকের উৎসাহ দেখলে আমি সব কষ্ট ভুলে যাই।

আমার মূল উদ্দেশ্য যত বেশি সংখ্যক বাংলা বই অনলাইনে নিয়ে আসা। মূর্চ্ছনা এই দিক থেকে অগ্রগামী,তাদের বইয়ের আমি বড় ভক্ত। তবে বিভিন্ন কারনে তারা অনেকদিন নিয়মিত বই দিচ্ছেন না,তাই আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। আমার সাইটের অনেক পাঠক মূর্চ্ছনার খোঁজ রাখেন না,তাদের জন্যই মূর্চ্ছনার কথা বললাম। আমি মূলত মূর্চ্ছনার সাথে মিল রেখে বই আপলোডের চেষ্টা করি,তাদের যে বইগুলো আছে,সেইগুলো আমি দিতে চাই না।

পরিশেষে একটা কথা না বললেই নয়। অনেকেকেই আমার সাইটের এ্যাডগুলো ব্রাউজ করেন,কিন্তু সঠিকভাবে না করার ফলে আমার খুব বেশি লাভ হয় না। আমি একটু গাইডেন্স দিই,কিভাবে ব্রাউজ করলে আমি উপকৃত হব।

যে লিংকটা ওপেন করবেন,সেটা ওপেন হলেই ক্লোজ করবেন না। বরং সেই সাইটের বিভিন্ন লিংকে যান,এবং এভাবে ২০-২৫ মিনিট অতিবাহিত করুন। পারলে আরও বেশি সময় সাইটটি খুলে রাখুন। তবে মাসে একবারের বেশি ব্রাউজ করার দরকার নেই। বাংলাদেশ থেকে যারা ব্রাউজ করেন,তারা ২ মাসে একবার ব্রাউজ করবেন। আর উপমহাদেশের বাইরে যারা আছেন,তারা মাসে ২ বারও করতে পারেন,সমস্যা নেই।

আপনাদের সাজেশন,অনুরোধ আমার একান্ত কাম্য। কোনও সংকোচ না করে আমাকে ত্রুটি বিচ্যুতির কথা বলতে পারেন,বইয়ের অনুরোধ জানাতে পারেন,আমি খুশি হব।

শেষে একটি কথা,আমি একজন সফটওয়্যার ডেভেলপার। আমার একটি মোবাইল জাভা সফটওয়্যার ২ লক্ষ্যের বেশীবার ডাউনলোড হয়েছে,এখনও হয়ে চলেছে। আপনারা যারা জানেন না,তারা মোবাইল ইংলিশ টু বাংলা ডিকশনারি টা ট্রাই করতে পারেন। www.getjar.com এ গিয়ে সার্চ বক্সে Bangla লিখে সার্চ দিলে দেখবেন Bdictionary চলে এসেছে। আপনাদের মতামতের অপেক্ষায় রইলাম।

বইয়ের আলোকে আলোকিত হোক আমাদের জীবন।

E-mail: ayan.00.84@gmail.com
Mobile: +8801734555541
+8801920393900